জাতীয় জীবনী গ্রন্থমালা

# উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

লীলা মজুমদার

অনুবাদ

সৈয়দ কওসর জামাল

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ISBN 81-237-0524-7

প্রথম প্রকাশ : 1993 (শক 1914)

দ্বিতীয় মুদ্রণ : 1999 (শক 1921)
মূল © লীলা মজুমদার, 1986

বাংলা সংস্করণ © ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, 1993
Upendra Kishor Ray Chaudhury *(Bangla)*

**মূল্য : 14.00 টাকা**

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-110016 কর্তৃক প্রকাশিত

# সূচীপত্র


| | | |
|---|---|---|
| বাংলায় নবজাগরণ | ... ... | 1 |
| গোড়ার কথা | ... ... | 4 |
| রায় পরিবার | ... ... | 7 |
| ছেলেবেলা | ... ... | 10 |
| কলকাতার জীবন | ... ... | 13 |
| নতুন নতুন ঘটনা | ... ... | 16 |
| অন্যান্য প্রভাব | ... ... | 18 |
| মানুষটি | ... ... | 22 |
| আর এক প্রজন্ম | ... ... | 25 |
| ইউ. রে এ্যান্ড সন্স | ... ... | 28 |
| মুদ্রণে দৃপ্ত পদক্ষেপ | ... ... | 32 |
| শতকের সমাপ্তি | ... ... | 35 |
| ছোটদের বই | ... ... | 39 |
| শিল্পী ও কবি | ... ... | 42 |
| সাহিত্যকৃতি | ... ... | 45 |
| উত্তরাধিকার | ... ... | 48 |
| শেষের কদিন | ... ... | 51 |

# বাংলায় নবজাগরণ

বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের একজন ছিলেন উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী। তাঁর পরিণত জীবনের গোটাটাই এবং সব কাজকর্ম কলকাতাতে কেন্দ্রীভূত হলেও তাঁর ভিত্তিভূমি ছিল পূর্ববঙ্গ, অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় - যেখানে তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে সাহসী কোন একজন বৈষ্ণবধর্মের প্রাণকেন্দ্র নদীয়া থেকে চলে গিয়েছিলেন প্রায় চারশো বছর আগে। তারও আগে অবশ্য পরিবারটি এসেছিল বিহার থেকে। তখন ওঁদের পদবী ছিল 'দেও' বা 'দেব'।

প্রথমে বাংলাকে উদ্দীপ্ত করেছে ও পরে উত্তরভারতে ছড়িয়ে পড়েছে এমন যে কোন গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের পীঠস্থান হিসেবে বরাবর থেকেছে কলকাতা। আধুনিক ভারতের জনক বলে যিনি পরিচিত সেই রাজা রামমোহন রায় এই কলকাতাতেই বাস করেছেন এবং এখানেই তাঁর কর্মজীবন কেটেছে, তিনি অবশ্য মারা যান ইংল্যাণ্ডের ব্রিস্টলে, ১৮৩৩ সালে।

ভারতীয় নবজাগরণের সূচনা করেছেন রামমোহন, শক্তিও জুগিয়েছেন তিনি। এই নবজাগরণের প্রসার ও তাৎপর্যময় হয়ে ওঠার প্রায় সত্তর বছর পরে উপেন্দ্রকিশোরের আবির্ভাব। রামমোহনের আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে ও যথাযথ রূপ দিতে তিনপুরুষ ধরে পরিশ্রম করেছেন আত্মত্যাগী ও কর্মনিষ্ঠ অনুরাগীরা। বাঙালী হিন্দুসমাজ তখন মধ্যযুগীয় আলস্য ছেড়ে আধুনিকীকরণের দিকে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। তবে আধুনিক জ্ঞানের আলোয় কুঅভ্যাস দূর করা এক ব্যাপার, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বসহ একটি জাতীয় চরিত্রগঠন যা তাকে পৃথিবীর অন্যসবার চেয়ে আলাদা করে দেখাবে, তা অন্য ব্যাপার। এক সুনির্দিষ্ট অর্থে নিজস্ব কাজের গন্ডীর মধ্যে থেকেই উপেন্দ্রকিশোর ও তাঁর মেধাবী সহযোগীরা এরকমটাই করতে চেয়েছিলেন। সন্দেহ নেই যে নবজাগরণের এই বিশেষ ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কারের চেয়ে চিন্তা ও সংস্কৃতির দিকটাই প্রাধান্য পেয়েছিল।

সৌভাগ্যের কথা, উপেন্দ্রকিশোর ও তাঁর বন্ধুরা এমন এক কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়েছিলেন যা কয়েকদশকের মধ্যে পৃথিবীর অগ্রসর জাতিগুলির মধ্যে নিজের জায়গা করে নিয়েছিল।

এই ক্ষেত্রটি ছিল শিশুসাহিত্য, বইয়ের অলঙ্করণ, ফটোগ্রাফি এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে বইয়ের মুদ্রণ ও প্রকাশনা।

লেখক ও শিল্পী, সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে উপেন্দ্রকিশোরকে ছাড়িয়ে যাওয়া এখনো দেশে সম্ভব হয়নি। সাহিত্যরচনা ও শিল্পসৃষ্টির দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, গগণেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শশী হেস প্রমুখ প্রবীন ও নবীন সমসাময়িকেরা যে জায়গায় পৌঁছেছিলেন, উপেন্দ্রকিশোর সেখানে পৌঁছতে পারেন নি। কিন্তু দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে তাঁর কৃতিত্ব কম ছিল না। বিদ্যা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পৃথিবীতে উন্নত দেশগুলির মধ্যে প্রধান ইংল্যান্ডে সেসময় যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো, সেই পদ্ধতিকে আরো উন্নত করতে ও নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে নানাধরনের নিরীক্ষা করার সাহস দেখিয়েছিলেন তিনি। তঁর এই উদ্ভাবনা ইউরোপেও প্রশংসিত ও গৃহীত হয়েছিল এবং তা পেনরোজেস্ এ্যানুয়ালের মতো ফটোগ্রাফি ও প্রযুক্তিবিষয়ক পত্রিকায় উল্লিখিত হয়েছে। ব্রিটিশ প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানীদের উদার মনোভাবের জন্য তখন বেশ সুনাম ছিল।

বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যাপারে উপেন্দ্রকিশোরকে একা এবং নিজের পয়সা খরচ করেই কাজ করতে হয়েছে, কিন্তু শিশুসাহিত্যর ক্ষেত্রে তাঁর সহযোগীর অভাব ছিল না। বইয়ের অলঙ্করণ করার কথাই ধরা যাক্। শিশুদের বইয়ের অলঙ্করণের জন্য সেসময় শিক্ষণ প্রাপ্ত ভালো শিল্পী প্রায় ছিল-ই না। সাধারণত যা করা হতো তা হলো -ইংরাজী বইয়ের অনুকরণ। পোশাক পরিচ্ছদ ও রঙে একটু অদলবদল করে দেওয়া হতো, আর সুন্দর ইংরাজ শিশু ও মায়েদের মুখগুলিকে বাঙালী করে দেওয়ায় চেষ্টা হতো। প্রথমদিকে যেসব ব্লক ব্যবহার করা হতো, সেগুলি হতো কাঠের, তাতে সূক্ষ্মতার অভাব ঘটতো। এইসব দেখে উপেন্দ্রকিশোর সন্তুষ্ট হতে পারেননি, তাই অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হননি। লেখক, শিল্পী ও মুদ্রকের যে প্রতিভা তাঁর মধ্যে ছিল, সবকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে পরিস্থিতির উপযোগী করে তুলেছিলেন।

বাংলার শিশুদের জন্য আধুনিক গ্রন্থপ্রকাশের সম্মান উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে আরো একজনের প্রাপ্য - তিনি হলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। স্কুল শিক্ষক, প্রকাশক ও লেখক এই মানুষটি ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের দু'বছরের ছোট। কিন্তু গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশনার জগতে দু'বছর আগেই এসেছিলেন। শিশুপাঠ্য গ্রন্থের জন্য সারা জীবনটাই উৎসর্গ করেছেন তিনি। সিটি বুক সোসাইটি নামে নিজস্ব প্রকাশনা কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন - এখান থেকেই উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম দুটি শিশুপাঠ্য বই প্রকাশিত হয়েছিল।

যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের সহকর্মী ও সহযোগী, বাংলা শিশুসাহিত্যের জগতে তাঁর নাম পথপ্রদর্শক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নিজে ভালো লেখক, তার ওপর তিনি প্রতিভাশালী একদল তরুণ লেখককে একত্র করেছিলেন এবং মৌলিক গল্প ও কবিতারচনা এবং ইংরাজী থেকে অনুসৃত রচনায় তাঁদের উৎসাহিত করেছেন। উল্লেখযোগ্য

বেশ কিছু রচনা এভাবেই তৈরী হয়েছিল। এইসব রচনা যোগীন্দ্রনাথ নিজে প্রকাশ করতেন অলঙ্করণসহযোগে এবং এ ব্যাপারে তাঁর চেষ্টা ছিল প্রকাশনার দিকটা সুন্দর করার - নিজের লাভের কথা ভাবেননি। পবিবারের আর্থিক প্রয়োজনটুকু মেটানো তাঁর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এভাবেই তিনি বাংলা শিশুসাহিত্যকে প্রথম শক্তি জুগিয়েছেন। এইসব মানুষের নাম সবসময় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমাদের স্মরণে থাকা উচিত।

একথা মনে রাখা দরকার যে শিশুসাহিত্যের জন্য যাঁরা নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন, তাঁরা তা নিঃস্বার্থভাবেই করেছিলেন এবং তাঁদের মনে কখনো কোন ব্যক্তিগত লাভের কথার উদ্রেক হলে তাঁরা লজ্জিত বোধ করতেন। শিশুদের ভালো বইয়ের দরকার, তাই ভালো বইয়ের ব্যবস্থা করা দরকার। তাঁরা সবাই পরিবারের প্রয়োজনে খুব সাধারণ জীবিকা গ্রহণ করেছেন। যোগীন্দ্রনাথ নিজে তো প্রথমদিকে ছিলেন স্কুলশিক্ষক। উপেন্দ্রকিশোর শুধু এক ক্ষুদ্র জমিদারের পালিত সন্তান ছিলেন বলে শিশুদের বইয়ের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করতে পেরেছিলেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি-ও এই উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছেন।

# গোড়ার কথা

কলকাতার পুরানো বাসিন্দা বলতে মাঝি, জেলে, কিছু চাষী ও দোকানদার ছাড়া তেমন আর কেউ ছিল না। সূতানটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা নামে তিনটি ছোটগ্রাম - এগুলির উল্লেখ করার মতো ব্যাপার ছিল একটাই। কালীঘাটে বিখ্যাত কালীমন্দিরে আসতে হলে এখানে আসতে হতো। রাস্তাঘাট বলতে তেমন কিছু ছিলনা। সতেরো শতকে জবচার্নকের নেতৃত্বে ইংরাজরা নিজেদের সুবিধের জন্যেই কলকাতা নগরীর পত্তন করে। জায়গাটা ছিল খুবই উপযোগী - সরাসরি সমুদ্রের ওপরে নয়, আবার অসুবিধে হওয়ার মতো দূরত্বেও নয়। এখানে তাদের জাহাজের মালপত্র নামানো ও ওঠানো হতো। তারপর আস্তে আস্তে জায়গাটা একটা নগরীর চেহারা নেয়। ব্যবসা জমে ওঠে, ছোট শহরটি বিত্তে ও গুরুত্বে বেড়ে উঠতে থাকে। কাঁচা মালের বাঙালী জোগানদার, কেরানী, ব্যাঙ্কমালিক, ঋণদাতা এরা সবাই শহরে এসে ভিড় করে। এতদিন পর্যন্ত শহর এলাকাটি শুধু সাদা চামড়ার বসবাসকারীদের জন্যই ছিল। কিন্তু তাদের প্রয়োজন মেটাতেই হাজির হয়েছিল অন্যরাও। আবার এদের প্রয়োজনে এলো আরো কিছু লোক। এইভাবে বেড়ে চলেছিল জনসংখ্যা।

ক্রমে এইসব বাঙালী বসবাসকারীদের বংশধর ও উত্তরসূরীরাই কলকাতার পুরনো বাসিন্দা হিসেবে গণ্য হয়। সাধারণ বাঙালী গ্রামবাসীদের তুলনায় এদের একটা বড় সুবিধে ছিল। এরা লেখাপড়া জানতো আর এদের অনেকেই ইংরাজদের বানিজ্যপ্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুবাদে কিংবা নিজস্ব ব্যবসা হলেও ইংরাজদের সংস্পর্শে আসার জন্যেও ইংরাজী ভাষাটা মোটামুটি শিখেছিল। এরা হলো মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। কয়েক দশকের মধ্যে নিজেদের ভেতর একটা শিক্ষিত সমাজ তৈরি করে নেওয়ার মতো শিক্ষাদীক্ষা তাদের হয়েছিল। বিত্তবান মানুষও শহরে এসেছিল, কিন্তু তারা এসেছিল শহর জীবনের সুযোগসুবিধেগুলি ভোগ করতে।

কলকাতার এই নতুন শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের আব সব মানুষকে অমার্জিত ও অজ্ঞ বলে একরকম অবজ্ঞার চোখেই দেখতো। আসলে তারা নিজেরাও বেশিরভাগ কলকাতায়

এসেছিল কাছাকাছি গ্রাম থেকে নানা সুযোগের খোঁজে । উনিশ শতকের গোড়ায় যখন রামমোহন রায়ের আর্বিভাব, তখন কলকাতায় তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের মানসিকতায় একটা স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছিল । বিদেশী চাটুকারিতা নয়, নিজস্ব উত্তরাধিকারকে মর্যাদা দিতে তারা শিখেছে ও নিজেদের সম্পর্কে গর্ববোধ জেগেছে । বস্তুত, শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে তখন দুটো ভাগ দেখা দিয়েছিল । একদলে ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতো অনেক মেধাবী তরুণ যাঁরা ভারতীয় সবকিছুকেই ঘৃণা করতেন এবং প্রথমদিকের ভিক্টোরীয় সমাজের হঠকারী অংশকে অনুসরণ করতেন । অন্যদল মনেপ্রাণে প্রাচীনপন্থী ।

এই দুই বিপরীত মেরুর মধ্যে একটা সুখকর সম্পর্ক স্থাপন করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন রামমোহন এবং ক্রমশ অবস্থা আয়ত্তে আসে । এর ফল হলো বাঙালীর চিন্তা ও সংস্কৃতির নবজাগরণ, যা উনিশ শতকের প্রথমদিকে সূচিত হয়ে ওই শতকের শেষদিকে সফল পরিণতি লাভ করে । কোন তাৎক্ষণিক রূপান্তর নয়, এটা ছিল ভেতরের স্থায়ী পরিবর্তন । আর এটা স্বীকার করতে হবে যে পূর্ববাংলার অনেক ধীমান ও আদর্শবাদী মানুষের এ ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান ছিল । এঁদের মধ্যে আনন্দমোহন বসু, কিয়দংশে উপেন্দ্রকিশোর এবং তাঁর বন্ধু ও প্রথমদিকের নেতা গগণচন্দ্র হোম ।

পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার লোক ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। আসামের পার্বত্য দক্ষিণাঞ্চলের নীচে সমতলে উত্তাল ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে বড় মসূয়া নামে গ্রাম । ব্রহ্মপুত্র নদী তখন মাইল ছয়েক এলাকাজুড়ে প্রায়ই দিকবদল করতো । তবু গ্রামাঞ্চলটি ছিল খুব সুন্দর - বড় বড় পুকুর ও ঘন আমকাঁঠালের বাগান ছিল, আর জমিও ছিল খুব উর্ব্বর । এখানকার রাঙা আলু ও সোনালী আনারস ছিল খুব বিখ্যাত । ময়মনসিংহের লোকগাথা ও লোকগীতির কদর ছিল সারা বাংলাজুড়ে । এসবের বেশ কিছু সংগ্রহ করেছিলেন প্রখ্যাত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী তাঁর অমূল্য গ্রন্থ 'ময়মনসিংহের গীতিকাব্য'-তে । মহুয়া ও চন্দ্রাবতীর হৃদয়গ্রাহী দুঃখগাথা আজও সবার ভালো লাগে । অনেক পথচারীকে গ্রামের পথে এইসব গান গেয়ে ঘুরতে দেখা যেত ।

এখানেই উপেন্দ্রকিশোরের পূর্বপুরুষেরা বাস করতেন । এর ওপর তাদের ছিল দুঃসাহসিক কাজকর্মের দিকে ঝোঁক । যুগযুগ ধরে ময়মনসিংহের সাহসী পুরুষেরা নোয়াখালি চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জায়গা থেকে শক্তসামর্থ নাবিক জোগাড় করে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে ।

পূর্ববঙ্গের গভীর জঙ্গল সুন্দরবনের সঙ্গে যুক্ত শান্ত বড় মসূয়া গ্রামে মাঝে মাঝে রয়াল বেঙ্গল টাইগারের আর্বিভাব ঘটতো । নদীতীরের তরমুজ খেত নষ্ট করে দিয়ে যেত বলে বুনোশেয়াল ধরার ফাঁদ পেতে রাখা হতো। একবার এক বাঘ সেই ফাঁদে ধরা পড়েছিল। শেষপর্যন্ত তার জায়গা হয়েছিল চিড়িয়াখানায় । গ্রামবাসীরা বাঘটিকে মেরে ফেলার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি ।

মসূয়া গ্রামের রায়েদের বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি ছিল। ভাষাবিদ, অংকশাস্ত্রবিদ, আইনজ্ঞ,

সংগীতশিল্পী ইত্যাদি হওয়ার জন্য তাঁরা যথেষ্ট সম্মান পেতেন । সাধারণ লোকেরা তাঁদের পরামর্শ নিতে আসতো । কিন্তু রায়েরা কখনো ধনী ছিলেন না । আসলে বিত্তের প্রতি কখনোই তাদের ঝোঁক ছিল না, সুখে স্বাচ্ছন্দে বসবাস করাই তাঁদের লক্ষ্য ছিল । গভীরভাবে ধর্মানুরাগী হলেও এঁরা ছিলেন উদার মনের । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সবে বিধবা বিবাহের পক্ষে চেষ্টা শুরু করেছেন, সেকথা গ্রামে তখনও এসে পৌছয়নি । সেইসময় উপেন্দ্রকিশোরের পিতা কোন এক বাল্যবিধবার পুনর্বিবাহ্ ক্ষমার চোখে দেখে আত্মীয়স্বজনদের আহত করেছিলেন। তবে কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেনি, কেননা কলকাতার শিক্ষিতসমাজের কাছে আশ্চর্যের শোনালেও একথা সত্যি যে সেইসময় পূর্ববাংলার গ্রামসমাজ অনেক ব্যাপারে, বিশেষ করে মেয়েদের ব্যাপারে, পশ্চিমবাংলার ছোট শহরগুলির তুলনায় বেশি অগ্রসর ছিল।

পুরুষদের ব্যাপারে সাধারণত মেয়েদের প্রবেশ না থাকলেও মেয়েরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতো। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েদের বেশিরভাগই বাংলা লিখতে ও পড়তে জানতো। যদিও মেয়েদের জন্য কোন বিদ্যালয় ছিলনা, নিজেদের চলার মতো ব্যবস্থা তারা করে নিতে পারতো। বস্তুত, উপেন্দ্রকিশোরের পিতা তুলনামূলকভাবে অল্পবয়সে যখন মারা যান, উপেন্দ্রকিশোরের মা একা তাঁদের গ্রামের বাড়িতে বাস করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যত্ন ও নিরাপত্তা দিয়ে মানুষ করেন।

# রায় পরিবার

আঠার শতকের প্রথম বছরগুলিতে শহর কলকাতা ইংরাজদের প্রধান ঘাঁটি হওয়ার জন্য সেখানে ইংরাজী ভাষার যে ব্যাপক ব্যবহার ছিল, প্রদেশগুলিতে তেমন ছিল না। তবে সারা বাংলা দেশেই শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ হিন্দুধর্মের প্রধান ভাষামাধ্যম সংস্কৃত এবং পাঠান-মুঘল আমলের আইন-আদালত ও সরকারী কাজকর্মের ভাষা আরবি ও ফারসি খুব ভালো জানতেন।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের আগে পর্যন্ত ইংরাজ সরকার সরকারী কাজকর্মের সমস্ত দায়িত্ব সরাসরি গ্রহণ করেনি, মুসলিম আমলের ব্যবস্থাদিই চলতো। আরবি ও ফারসিতে ব্যাপক জ্ঞানের জন্য অনেক হিন্দু পন্ডিত হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের কাছেই সমান মর্যাদা পেয়েছেন। অবাক হওয়ার মতো বিষয় হলো, নিজ নিজ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যত গোঁড়া হোক না, দুই সম্প্রদায় যুগযুগ ধরে বন্ধুভাবেই বাস করে এসেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা সেসময় শোনাই যেত না। ১৮৩৩ সালে ইংরাজী সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয়, কিন্তু সর্বত্র এর প্রচলন হতে অনেক বছর লেগেছিল। তবে বাঙালীরা খুব দ্রুত ইংরাজী শিখে নিয়েছিলেন।

মসূয়া গ্রামের রায়েরা ছিলেন জাত ভাষাবিদ। মুসলিম আইন তাঁরা এত ভালো জানতেন যে আইনের কোন বিষয়ে সংশয় দেখা দিলে আদালতের উকিল ও মৌলভীরা তাঁদের কাছে উপদেশ নিতে আসতেন। মুসলিম আইনের বিভিন্ন বিষয়ে, বিশেষ করে জমিজমা ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে রায়েদের বিশেষ দক্ষতা ছিল। জমি পরিমাপের কাজ ও হিসেবনিকেশের ব্যাপারেও তাঁদের দক্ষতা ছিল। এর ফল হিসেবে, আদালত ও সরকারী অফিসে তাদের চাকরির অভাব হতো না ও তারা সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন।

পুরনো পারিবারিক নথিপত্র থেকে যতদূর জানা যায়, সর্বপ্রথম পূর্বপুরুষ যিনি পনেরো শতকের শেষে কিংবা ষোল শতকের প্রথমে এই পূর্ব প্রদেশে এসেছিলেন, তিনি রামসুন্দর দেব। তিনি এসেছিলেন আর্থিক উন্নতির আশায় অথবা দেশ দেখার আগ্রহে, কিন্তু আর গ্রামে

ফিরে যাননি। গ্রাম অর্থাৎ নদীয়া জেলার চাকদহ - যেখানে তাঁদের পরিবার বিহার থেকে এসে বসবাস শুরু করেন।

বঙ্গদেশে তখন উত্তাল সময় বইছে - পুরনো পাঠান শাসন ভেঙে পড়েছে, কিন্তু বাংলার বারভূঁইয়া তখনও মুঘল আগমনকে প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আকবর ইতিমধ্যে দিল্লীর মসনদে বসেছেন, কিন্তু বারভূঁইয়াদের মৌখিক প্রতিশ্রুতিতেই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। এইরকম একটা সময়ে সাহসী ও সুপুরুষ রামসুন্দর দেব সেরপুর নামে ছোট বর্ধিষ্ণু এক গ্রামে পৌছান। তখনও ময়মনসিংহ জেলা হিসেবে গড়ে ওঠেনি। বুদ্ধিমান তরুণের মতোই রামসুন্দর হাজির হলেন স্থানীয় জমিদারের কাছে। জমিদার তাঁর সুন্দর ব্যবহার আচরণ ও জ্ঞানবুদ্ধিতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে এক দায়িত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক পদে নিয়োগ করেন। রামসুন্দরও এই উদার পৃষ্ঠপোষকতার যথাযথ মর্যাদা রাখেন। রামসুন্দর পরে যশোদলের জমিদার রাজা গুনিরাম রায়ের কন্যাকে বিয়ে করেন এবং যশোদলে এসে বসবাস করতে থাকেন।

এই রামসুন্দরই হলেন অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত ময়মনসিংহ জেলার মসূয়া গ্রামের প্রতিভাধর রায়পরিবারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর নাতি রামনারায়ণ মসূয়ায় অশান্ত ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে নিজের বাড়ি তৈরি করেন। তাঁর বংশধরেরা অন্যান্য গ্রামবাসীদের চেয়ে অন্যধরণের - কবি ও গায়ক হিসাবে অনেকেই ছিলেন উচ্চমানের, আর অনেকের আবার খ্যাতি জন্মে সাহসিকতা ও শারীরিক সামর্থ্যের জন্য ।

ইতিমধ্যে তাঁরা 'দেব' উপাধি ত্যাগ করে 'রায়' হয়েছেন । এদের এক শরিক ছোট একটা জমিদারী কিনে নাম নিয়েছিলেন 'রায় চৌধুরী' ।এ সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ দেখানোর কারণ হলো এদেরই এক বংশধর চারবছর বয়সের উপেন্দ্রকিশোরকে দত্তক নিয়েছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরও সর্বদা এই 'রায়চৌধুরী' নামেই পরিচিত হয়েছেন । যদিও তাঁর পুত্র ও পৌত্ররা আর 'চৌধুরী' ব্যবহার করেননি ।

রামনারায়ণের দুই পুত্র - ব্রজরাম ও বিষ্ণুরাম । ব্রজরামের ছেলে রামকান্ত শিক্ষাদীক্ষা ও অসাধারণ শারীরিক ক্ষমতা পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে। শোনা যায় বৃদ্ধবয়সে তিনি নাকি খালি হাতেই একটা বুনো শূয়োর মেরেছিলেন । তাঁর গানের গলাও ছিল চমৎকার - তিনি গান গাইলে ব্রহ্মপুত্র নদীর অন্যপার থেকে তা শোনা যেতো ।

রামকান্তের দুই ছেলের নাম লোকনাথ আর ভোলানাথ। অঙ্কে খুব মেধা ছিল লোকনাথের, জরিপের কাজে ছিল তাঁর আশ্চর্য দক্ষতা। কিন্তু তিনি এত ধার্মিক প্রকৃতির ছিলেন যে বাবা-মার ভয় ছিল ছেলে না সন্ন্যাসী হয়ে যায়। তাই তাঁরা তাঁর বিয়ে দিয়ে দেন কৃষ্ণমণি নামে সুন্দরী একটি মেয়ের সঙ্গে। তাতেও মন ফিরলো না, দিনরাত তাঁদের ছেলে ডামরগ্রন্থ, নরকপাল আর মহাশঙ্খের মালা নিয়ে ডুবে থাকতেন। তন্ত্র সাধনার বই ডামরগ্রন্থ। মানুষের মাথার খুলি দিয়ে তৈরি মহাশঙ্খের মালা। একদিন লুকিয়ে তাঁরা ওই তিনটে ব্রহ্মপুত্র নদীর জলে ফেলে দিয়ে আসেন। ফল হলো উল্টো। সাধনার জিনিশ না পেয়ে লোকনাথ সেই যে শয্যা নিলেন, আর

উঠলেন না। তৃতীয় দিনে বৃদ্ধ বাবা-মা, তরুণী স্ত্রী ও শিশুপুত্র রেখে তিনি দেহত্যাগ করেন।

পারিবারিক কাহিনী আছে যে, মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর স্ত্রীকে ডেকে আশ্বস্ত করেছিলেন এই বলে যে 'এই পুত্র থেকে তুমি শতপুত্রপাবে।' এই পুত্রের নাম দেওয়া হয়েছিল কালীনাথ। পারিবারিক প্রতিভার সব বৈশিষ্ট্যগুলিই কালীনাথ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। জাত ভাষাবিদের মতোই তিনি চোখের সামনে সংস্কৃত, ফারসি বা আরবি ভাষার পান্ডুলিপি রেখে এই তিনটি ভাষার যেকোনোটিতে অথবা বাংলাতে তিনি আলোচনা চালিয়ে যেতেন এমনভাবে যে শ্রোতারা বুঝতে পারতো না মূল পাঠটি কোন ভাষার রচনা। তারা ওঁকে পান্ডিত্যের জন্য ডাকতো শ্যামসুন্দর মুন্সী নামে। তাঁর গানের গলাও ছিল অসাধারণ।গ্রামের বড় দিঘিতে প্রাতঃস্নান করার সময় তিনি যখন স্তোত্র উচ্চারণ করতেন, তখন দিঘির চারপাশের লোকেরা ভিড় করতো তা শোনার জন্য এবং সম্মানজনক দূরত্বে থেকে তারা তাঁকে বাড়ি পর্যন্ত অনুসরণ করতো।শ্যামসুন্দরের স্ত্রীর নাম ছিল জয়তারা।তাঁদের তিন কন্যা ও পাঁচ পুত্র - এই পুত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় হলেন উপেন্দ্রকিশোর।

# ছেলেবেলা

শ্যামসুন্দরের আট পুত্রকন্যার মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন তৃতীয়, আর পুত্রদের মধ্যে দ্বিতীয়। বড় ছেলে সারদারঞ্জনের নামের সঙ্গে মিল রেখে তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল কামদারঞ্জন। বুদ্ধিমান ও সুদর্শন চার পাঁচ বছর বয়সের উপেন্দ্রকিশোরকে দত্তক নেন তাঁদের আত্মীয় হরিকিশোর রায়চৌধুরী। হরিকিশোর আসলে ছিলেন রামকান্তের কাকা সোনারামের উত্তরপুরুষ। সোনারামই প্রচুর টাকাপয়সা রোজগার করে জমিদারী কিনেছিলেন এবং 'রায় চৌধুরী' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

সাধু প্রকৃতির মানুষ হরিকিশোর, কিন্তু চিন্তাধারার দিক থেকে তিনি ছিলেন প্রাচীনপন্থী। তাঁর অনেকগুলি কন্যা, কোন পুত্র ছিল না। ভাগ্যের এমন পরিহাস, উপেন্দ্রকিশোরকে দত্তক নেওয়ার কয়েক বছর পরই তাঁর স্ত্রী সুন্দর এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। এই পুত্রের নাম রাখা হয়েছিল নরেন্দ্রকিশোর এবং কার্যত সে উপেন্দ্রকিশোরের ছোটভাইয়ের মতোই মানুষ হয়েছে।

হরিকিশোরের বাড়িতে সুখেই দিন কেটেছে উপেন্দ্রকিশোরের। এমনকি সবার কাছে বড় বেশি আদর পেতে পেতে তার বিগড়ে যাওয়ার অবস্থা। নিজের পরিবারের থেকে দূরে থাকার বেদনাও তাকে সইতে হয়নি, কেননা দুটো বাড়ি ছিল খুব কাছাকাছি। উপেন্দ্রকিশোর পরে নিজের ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প করেছেন যে নতুন বাড়িতে সবাই তাকে এত ভালোবাসতো যে সামান্য বকুনি বা শাসন তিনি সহ্য করতে পারতেন না। যদি কখনো কেউ তাকে দুষ্টুমির জন্য বকতো, অমনি তিনি দুই বাড়ির মাঝখানে দাঁড়িতে 'ওরে আমার কেউ নেই রে !' বলে চিৎকার করে কাঁদতেন। দু-বাড়ির লোকজন স্বভাবতই ওই চিৎকার শুনে ছুটে আসতেন ব্যাকুল হয়ে - দুষ্টু বালকের সেটাই ইচ্ছে ছিল।

শ্যামসুন্দরের ছেলেমেয়েরা গ্রামের অন্য সবার মতো নয় - তাদের আচরণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত, তাদের ছিল উদার মন ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি। যে শিশুটিকে হরিকিশোর না জেনে বাড়িতে এনেছিলেন, সে কখনো গ্রামের প্রচলিত জীবনধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলেনি। এটা

হরিকিশোরের উদারতা বলে স্বীকার করা উচিত যে তিনি কখনো তাঁর দত্তক পুত্রটিকে খাপছাড়া আচরণের জন্য শাসন করেননি, বরং চেষ্টা করেছেন নরেন্দ্রকিশোরকে প্রচলিত ধ্যানধারণা অনুযায়ী একজন সম্মানীয় মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে। উপেন্দ্রকিশোরের ব্যবহার যেমন ছিল খুব সুন্দর, মেধাও ছিল তেমনি প্রখর। শিল্পী হয়েই জন্মেছিলেন তিনি - নিজের স্কুলপাঠ্য বইগুলিকে নিজের অলঙ্করণ দিয়ে ভরিয়ে তুলতেন। গানেও তার প্রতিভা ছিল, সহজেই সুর তৈরি করতে পারতেন, আর দারুণ ভালো বাঁশি বাজাতেন।

এই বিচিত্র বালকটিকে ঠিকমতো বুঝতে না পারলেও তাকে নিয়ে হরিকিশোরের গর্ব ছিল। এই কারণে তার মেধার বিকাশের জন্য সবরকম ব্যবস্থাই করেছিলেন। লোকনাথের রক্ত বালকের ধমনীতে প্রবাহিত হওয়ায় নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ছিল তার অসাধারণ দৃঢ়তা। একটু বেশি বয়সেই তাকে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল ময়মনসিংহ বয়েজ হাইস্কুলে। ময়মনসিংহ শহরেও হরিকিশোরের সুন্দর বাড়ি ছিল। কিন্তু স্কুলের শিক্ষকরা উপেন্দ্রকিশোরের চালচলনে খুব বেশি সন্তুষ্ট ছিলেন না, কেননা পড়াশুনার চেয়ে ছবি আঁকা ও গানবাজনায় ছিল তার বেশি ঝোঁক। ইতিমধ্যে সে বাঁশি বাজানো শিখে বেহালা বাজানো শিখছে। তবু এমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যে পরীক্ষার ফল সর্বদাই ভালো হতো। পরে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলেও ঐ একই ব্যাপার। পড়াশুনা করতে বড় একটা দেখা যেত না, কিন্তু প্রশ্ন করলেই ঠিক উত্তর পাওয়া যেত। একবার জিগ্যেস করা হয়েছিল, 'পড়িস্ টড়িস্ না, শুধু বাঁশি বাজিয়ে দিন কাটাস্, কিন্তু ঠিক উত্তর দিস্ কী করে?' উপেন্দ্রকিশোরের উত্তর ছিল, 'অন্য ছেলেরা যখন চিৎকার করে পড়ে, তখন আমি শুনি। তাতেই হয়ে যায়।' তার সম্পর্কে হরিকিশোরের কাছে নানা অভিযোগ আসতো, তিনি প্রায়ই ভাবতেন এবার এই পুত্রটিকে সাবধান করে দেওয়া দরকার। নিজের মতো করে চলাফেরা করার অভ্যেস সত্ত্বেও ছেলেটির শিল্পীসুলভ অনুভূতি ও স্পর্শকাতরতা ছিল। ফলে কিছু বললেই বাঁশি ছুড়ে ফেলে দিত, বেহালা ভেঙে ফেলতো, আর তারপর শুধু পড়াশুনা নিয়েই থাকতো। এর ফলে হতো কী, বছর শেষে ক্লাসের পরীক্ষায় প্রথম হতো।

এসবই শুধু তার অভিভাবকদের চিন্তার একমাত্র কারণ ছিল না। একবার এমন এক ছেলের সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের বন্ধুত্ব হলো, যাদের হরিকিশোরের পরিবারের কেউ পছন্দ করতেন না। তাঁর নাম গগণচন্দ্র, বয়সে উপেন্দ্রকিশোরের চেয়ে বড়ই হবে। সেও রায়চৌধুরীদের মতোই সম্মানীয় পরিবারের ছেলে। গগণচন্দ্র তখন কলকাতায় পড়াশুনা করতেন এবং রাজা রামমোহন রায়ের অনুসারী অনেকের সঙ্গে তাঁর আলাপ। এঁরা সবাই ব্রাহ্মসমাজের লোক। ব্রাহ্ম নেতাদের কাছ থেকে শেখা অনেক সাহসী ধ্যানধারণা গগণচন্দ্র শোনাতেন উপেন্দ্রকিশোরকে। তরুণ উপেন্দ্রকিশোরের মনে সেইসব চিন্তার ছাপ পড়তো। তাছাড়া তাঁর মনেও নানা উদারনৈতিক চিন্তার স্থান ছিল। ব্রাহ্মরা মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করতেন না, বর্ণভেদ মানতেন না। তাঁরা তাঁদের বাড়ির মেয়েদের স্কুলে পাঠাতেন, তাঁরা পর্দাপ্রথাও তুলে

দিয়েছিলেন। বালবিধবার পুনর্বিবাহে হিন্দুশাস্ত্রের যে সায় আছে তা দেখাতে তাঁরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কাজ করেছেন। বাড়ন্ত বালকদের কাছে এসব ছিল তাদের মনের উপযোগী খোরাক।

গগণচন্দ্রের সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের বন্ধুত্বের কথা শুনে রক্ষণশীল হরিকিশোর মর্মাহত হয়েছিলেন। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরের পিতা শ্যামসুন্দরের কাছে এসব জানিয়ে কোনো লাভ হবে না তা তিনি জানতেন। তাছাড়া শ্যামসুন্দরের বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের প্রতি হরিকিশোরের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। শ্যামসুন্দরের কোন ব্রাহ্ম বন্ধু না থাকলেও তাঁর মতামত ছিল অভাবিত - তিনি নিজেই তাঁর এলাকায় বিধবাবিবাহ সমর্থন করেছিলেন। পুত্রের মতো পিতার মনেও নানা আশ্চর্যজনক ও স্বাধীন ভাবনাচিন্তার উদয় হতো।

অনেক ভেবেচিন্তে হরিকিশোর নিজেই একদিন উপেন্দ্রকিশোরকে ডেকে বললেন সে যেন গগণের বাড়ি না যায় কিংবা গগণকেও কখনো যেন রায়চৌধুরী বাড়িতে না ডাকে। হরিকিশোর অবশ্যই তাঁর মনে কোন আঘাত দিতে চাননি। উপেন্দ্রকিশোরও তেমনি তাঁর আদেশ অমান্য করলেন না - গগণদের বাড়ি আসা-যাওয়া বন্ধ করে দেন।

বুদ্ধিমান ছেলেদের নতুন পরিকল্পনা উদ্ভাবন করতে দেরি হয়নি। গগণচন্দ্র কাউকে না জানিয়ে কাছের একটা আমবাগানে গিয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিতেন, আর উপেন্দ্রকিশোর নিঃশব্দে সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন, কেউ জানতে পারতো না। উপেন্দ্রকিশোরের প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ ও আরো পড়াশুনার জন্য কলকাতা আসা পর্যন্ত এইভাবে তাদের দেখা হতো। যেমন খুশি আচরণের জন্য হরিকিশোর কোনদিন তাঁকে স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেননি, কার্পণ্য করেননি টাকাপয়সা যোগাতে, কারণ তিনি জানতেন যে উপেন্দ্রকিশোরকে বিশ্বাস করা যায়।

# কলকাতার জীবন

নানা বিষয়ে নিজেকে জড়িয়ে রেখেও উপেন্দ্রকিশোর যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় দারুণ ভালো ফল করে বৃত্তি পেলেন, তখন আত্মীয়স্বজন বন্ধুরা সবাই অবাক হয়ে গেল। আরো পড়াশুনার জন্য তাঁকে কলকাতা পাঠানো হল। আর এখানেই উপেন্দ্রকিশোরের ময়মনসিংহের জীবন শেষ হয়ে গেল। কার্যত তিনি কলকাতাকেই নিজের গৃহ করলেন। কখনো কখনো তিনি আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে এবং পুরনো পরিচিত জায়গায় বেড়ানোর জন্য যেতেন, কিন্তু শীঘ্রই তিনি কলকাতার শিক্ষাসংস্কৃতির জীবনে এমনভাবে জড়িয়ে পড়লেন যে কখনো তিনি নিজেকে কক্ষচ্যুত মনে করেননি।

উপেন্দ্রকিশোর প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বর্ষের ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন, আর ওই কলেজ থেকেই চার বছর পর স্নাতক হয়ে বেরিয়ে আসেন। তারপর তিনি সারাজীবনই কলকাতায় বাস করেছেন। যে পরিবারের পালিত পুত্র হয়ে তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে, সেই পরিবারের সঙ্গে হার্দিক সম্পর্কটুকু ছাড়া আর কোন বিষয়েই তাঁর মিল ছিল না। অল্প বয়স থেকেই তাঁর মানসিকতা ছিল ভিন্ন ধরনের। হরিকিশোরের পরিবারে যথেষ্ট স্নেহ-ভালোবাসার মধ্যে মানুষ হয়ে উঠলেও তিনি সম্পূর্ণত ছিলেন বিষয়বিমুখ শ্যামসুন্দরেরই পুত্র। সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি বইয়ের মধ্যে শ্যামসুন্দরের মন সবসময় নিমগ্ন থাকতো। তিনি নিজে নিজে কিছুটা ইংরাজীও শিখেছিলেন, যা সেসময়কার গ্রামাঞ্চলে বিরল কৃতিত্বের বিষয়। ধ্যানধারণায় তিনি ছিলেন অস্বাভাবিক রকমের উদার। কিন্তু তাঁর মনের ভিতরে ছিল গভীর ঈশ্বরভক্তি। তিনি সংস্কৃতে ভক্তিগীতিও রচনা করেছিলেন এবং অসাধারণ গলায় সেগুলি গাইতেনও। কেউ জানেনা, কেন তিনি তাঁর সুদর্শন ও মেধাবী পুত্রকে বিত্তবান আত্মীয়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বৈষয়িক উন্নতির দিকে কখনো কোন আকর্ষণ তিনি বোধ করেননি। সম্ভবত তাঁর দয়ার্দ্র চিত্তের জন্যেই তিনি তাঁর পুত্রসন্তানহীন আত্মীয়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছিলেন। এ ছাড়া, পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও তিনি আগে থেকে অবহিত ছিলেন না। এতসব সত্ত্বেও উপেন্দ্রকিশোর শ্যামসুন্দরেরই পুত্র থেকেছেন এবং নিজের ভাইবোনদের

সঙ্গে তাঁর আবেগানুভূতির বন্ধন সারাজীবন অটুট থেকেছে। তাঁরাও উপেন্দ্রকিশোরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, বসবাস শুরু করেছেন কলকাতাতে।

ছেলেমেয়েরা সব বড় হবার আগেই শ্যামসুন্দরের মৃত্যু হয়। উপেন্দ্রকিশোর তখনও সম্ভবত কলেজ পেরোননি। জ্যেষ্ঠপুত্র সারদারঞ্জন তাঁর অশক্ত কাঁধে তখনই দায়িত্ব তুলে নেন ভাইদের শিক্ষিত করে তোলার। সময়মতো ছোটবোন মৃণালিনীর বিয়ের ব্যবস্থাও তিনি করেন। একুশ বছর বয়স না পেরোতেই সারদারঞ্জন সংস্কৃত ও অঙ্কে এম, এ, পাস করেছিলেন। সাংগীতিক বা শিল্পের গুণ সারদারঞ্জনের ছিল না, তিনি ছিলেন মেধাবী গণিতশাস্ত্রবিদ ও সংস্কৃতজ্ঞ - তাঁর লেখা সংস্কৃত ব্যাকরণ বছরের পর বছর ধরে কলেজের ছাত্রদের পাঠ্য হয়েছে। তাঁর জীবন কেটেছে বিদ্যায়তনের পরিবেশে। অধ্যাপনা করেছেন মেট্রোপলিটান কলেজে, পরে সেখানেই অধ্যক্ষ হন। এই কলেজের এখনকার নাম বিদ্যাসাগর কলেজ। তাঁর চরিত্র, সততা ও আত্মসম্মানবোধ দেশের লোকের কাছে প্রেরণার মতো ছিল।

তবে সারদারঞ্জনের সবচেয়ে বড় অবদান হলো কলেজে শারীর শিক্ষা ও খেলাধূলার প্রবর্তন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, যে শিক্ষাকে শুধু শ্রেণীকক্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, খেলার মাঠও শিক্ষার স্থান হতে পারে। ভারতে ক্রিকেট খেলার জনপ্রিয়তার প্রথম বীজটি তিনিই রোপণ করেন। আর দেখতেও তিনি ছিলেন বিখ্যাত ক্রিকেটার ডব্লিউ. জি, গ্রেসের মতো। এমন একজন মানুষকে বিশ বছর বয়স পেরোতেই বাঁচার সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয়েছিল।

কলকাতায় থাকলেও মসূয়া গ্রামের বাড়ির দেখাশোনা সারদারঞ্জনকেই করতে হতো। সেখানে তখন থাকতেন তাঁর পিতামহী, লোকনাথের দুঃখী স্ত্রী কৃষ্ণমণি ও মা জয়তারা। এঁরা দুজনে ছোট ছোট দুরন্ত ছেলেমেয়েদের দেখতেন। এইসব হলো ১৮৮০ সাল বা তার আশেপাশের সময়ের ঘটনা। উপেন্দ্রকিশোর এর আগেই কলকাতা এসে থাকতে শুরু করেছেন এবং মনের আনন্দে নিত্যনতুন চিন্তার জন্ম দিচ্ছেন। সম্ভবত গগণচন্দ্র হোম তখন একাধারে তাঁর বন্ধু ও অভিভাবকের ভূমিকায়। তাঁর মাধ্যমেই উপেন্দ্রকিশোর একদল বলিষ্ঠ ও নির্ভীক সমাজকর্মীর সংস্পর্শে আসেন, এরা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, বাংলায় এমন এক উদার ও শিক্ষিত সমাজ গড়ে তোলা যেখানে নারী ও শিশুর যথাযথ স্থানে থাকবে। এঁরা ছিলেন নিঃস্বার্থ ও আশাবাদী, উচ্চশিক্ষিত ও বিত্তহীন - সমাজপরিত্যক্ত এবং প্রায়শই রক্ষণশীল পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। সাধারণ কাজ করে তাঁরা নিজেদের প্রতিপালন করতেন, কিন্তু সমাজের কাজে সম্পূর্ণ ভাবে তাঁরা নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। নারী শিক্ষা ও শিশুদের উপযোগী ভালো বইয়ের প্রকাশনাও ছিল তাঁদের লক্ষ্য, এর জন্য তাঁরা কোন লাভ বা পুরস্কারের আশা না করেই কাজ করে গেছেন। এঁদের এই আদর্শ ছিল উপেন্দ্রকিশোরের মনের মতো।

এইসব মানুষগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও

ঠাকুর পরিবারের অন্যান্যরা, পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শেষ নামটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো, সে কথায় আসছি।

দ্বারকানাথ ছোটবড় সবার কাছে দ্বারিকবাবু নামে পরিচিত ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার সমস্যাকে তিনি নিজের কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নানা গল্পকথা শোনা যায়। এই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সুস্বাস্থ্য ও আত্মবিশ্বাস মিলে তাঁকে অনেক ক্ষেত্রে বিজয়ী করেছিল। এইসব দৃঢ়চেতা ও স্পষ্টবক্তা সমাজ সংস্কারকদের জন্য তৎকালীন অনেক প্রাচীনপন্থী পরিবারে কী ঝড়ই না বয়ে গেছে! একবার স্থানীয় এক কাগজের সম্পাদকীয়তে আধুনিক স্বাধীন নারীদের সম্পর্কে কিছু অবজ্ঞাসূচক মন্তব্য করা হয়েছিল। তাই দেখে দ্বারিকবাবু খুব ক্ষুব্ধ হলেন - তিনি কাগজের ওই অংশটুকু কেটে পকেটে পুরলেন, তারপর হাতের ছড়িটি বাগিয়ে সেই সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তার অফিসে।

অফিসে সম্পাদক একা ছিলেন। দ্বারিকবাবুকে দেখে তিনি কিঞ্চিৎ অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। দ্বারিকবাবু বললেন, "শিক্ষিত মহিলাদের সম্পর্কে আপনি যে লেখাটি ছেপেছেন, সেটি আমি আপনাকে খাওয়াতে এসেছি।" এই বলে কাগজটা পাকিয়ে ছোট করে সম্পাদকের কুঁজো থেকে এক গেলাস জল নিয়ে তখনই সেটি খেয়ে ফেলার জন্যে জোর করতে থাকেন। পরের দিনের কাগজে সম্পাদক মশায় ক্ষমা চেয়ে তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

এইধরণের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার পর উপেন্দ্রকিশোরের মনে যে কিরকম প্রতিক্রিয়া হতো তা কল্পনা করা কঠিন নয়। প্রথমদিকে কলকাতার জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে তাঁর অসুবিধে হতো, কেননা গ্রামের শান্ত জীবনযাপনে তিনি ছিলেন অভ্যস্ত। কিন্তু খুব শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে শহরে তিনি তাঁর নিজের পরিবেশ খুঁজে পেয়েছেন। বই লেখা হচ্ছে, ছাপাও হচ্ছে। শিবনাথ শাস্ত্রী ও আরো অনেকে তখন শিশুদের জন্য শিক্ষামূলক পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন। অনেকগুলিতে অলঙ্করণও থাকতো। অলঙ্করণগুলি কাঠের ব্লক থেকে ছাপা হলেও ছবি পাওয়া যেতো। নিজের খাতায় যে তরুণ নানাধরনের ছবি আঁকতেন, ছবি আঁকার তুলি হাতে নিয়ে তাঁর রোমাঞ্চিত হবারই কথা।

উপেন্দ্রকিশোরের কলেজের ক্লাস যখন শুরু হলো, বিজ্ঞানের নতুন জগৎ তাঁর বিস্মিত চোখের সামনে উপস্থিত হলো। কিছুদিন পরই হয়তো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। কবি দু'বছরের বড় ছিলেন তাঁর চেয়ে, আর খুবই বন্ধুভাবে লোকজনের সঙ্গে মিশতেন। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গান, নাটক ও সাহিত্যের একটা পরিবেশ ছিল - সূর্যালোকে কুঁড়ির প্রস্ফুটিত হওয়ার মতোই উপেন্দ্রকিশোরের মন এই পরিবেশে আলোকিত হয়েছিল। অনেক গুণী শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। আর নিজে খুব ভালো ছাত্র হওয়ায় সময়মতো কলেজ থেকে পাশ করে বেরোতে অসুবিধে হয়নি।

# নতুন নতুন ঘটনা

কয়েক বছরের মধ্যেই শ্যামসুন্দরের বড় তিন পুত্রই কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস শুরু করেন। একশ বছর আগে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবারা কম বয়সেই বয়স্ক হয়ে উঠতেন। সবাই বিবাহিত হয়ে সংসারজীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। নিজেদের পরিবারের লোকেরাই এই বিয়ের ব্যবস্থা করতেন, আর সাধারণত কনের বয়স চোদ্দ বছরের মধ্যেই হতো। বিয়ের আগে চোখে দেখেননি, এমন এক কন্যাকে রবীন্দ্রনাথও এইভাবে বিয়ে করেছিলেন। একথা অবশ্যই স্বীকার করা উচিত যে আধুনিক বিয়ের তুলনায় সেদিনের বিয়ে কম স্থায়ী বা কম সুখের হতো না।

সারদারঞ্জনের বিয়ে অল্পবয়সেই হয়েছিল, এখন উপেন্দ্রনাথের বিয়ের পালা। কিন্তু সমস্যা হলো, উপেন্দ্রকিশোর যে প্রথামতো দেখাশোনা করা বিয়েতে মত দেবেন না হরিকিশোর তা জানতেন। তাই তিনি ব্যাপারটা উপেন্দ্রকিশোরের ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর উপেন্দ্রকিশোর সেসময় যা সবচেয়ে বেশি চাইতেন তা হলো নিজের ইচ্ছেমতো জীবনযাপন করা। তাঁর লেখা ইতিমধ্যেই ছাপা হয়েছে। 'সখা', 'সখা ও সাথী', 'মুকুল' ইত্যাদি শিশুদের পত্রিকায় তাঁর তথ্যমূলক রচনা নিয়মিত প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। বেশির ভাগ জীববিজ্ঞান বিষয়ক রচনা, সহজ কেতাবী বাংলায় লেখা। আর বিষয়বস্তু সাধারণত ইংরাজী খবরের কাগজ থেকে সংগ্রহ করা। এগুলি কোন মৌলিক রচনা নয় - অলঙ্করণ খুবই কম থাকতো, আর সেগুলি মূলত বিদেশী অলঙ্করণের প্রভাবে অন্য কারো তৈরি। উপেন্দ্রকিশোরের সেসময় মৌলিক রচনা হলো তাঁর কবিতা ও ভক্তিমূলক গান। এগুলি ছিল উচ্চ মানের। এ প্রসঙ্গে একথা বলে নেওয়া দরকার যে শিশুদের জন্য গল্পে কথ্য বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রথম যাঁরা করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর তাঁদের একজন।

সমাজসেবার ক্ষেত্রে যে মানুষটি তাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন বেশি, তিনি নিঃসন্দেহে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। কন্যা বিধুমুখী ও এক রুগ্ন পুত্র রেখে দ্বারকানাথের প্রথম স্ত্রী অনেকদিন আগেই মারা যান। দ্বারিকবাবুর উৎসাহে ও আগ্রহে মেধাবী এক তরুণী বিধবার

উচ্চশিক্ষা লাভ হয়। দ্বারিকবাবু তরুণীর আত্মীয়স্বজনকে বুঝিয়ে প্রথমে তাকে স্কুলে ও কলেজে পড়ানোর ব্যবস্থা করেন। এই তরুণীর নাম ছিল কাদম্বিনী বসু। চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী ভারতেই প্রথম দুই মহিলা গ্র্যাজুয়েট। সেসময় ইংল্যাণ্ডেও মেয়েদের গ্র্যাজুয়েট হতে দেওয়া হতো না।

দ্বারিকবাবু ব্রাহ্মমতে কাদম্বিনীকে বিয়ে করেন। তারপর তাঁকে কলকাতার মেডিকেল কলেজে পড়াশুনার জন্য ভর্তি করে দেন এবং সেখান থেকে কাদম্বিনীই প্রথম মহিলা যিনি গ্র্যাজুয়েট হন। বেশ কয়েক বছর তিনি ডাক্তারি প্র্যাকটিস করেন, কিন্তু স্বামীর অদম্য ইচ্ছায় তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেত যান। বিলেত থেকে ফিরে তিনি আজীবন চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত থাকেন।

সম্ভবত ১৮৮৫ সালে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথম পক্ষের কন্যা বিধুমুখীর সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের বিয়ে হয়। তারপর তিনি কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের উল্টোদিকে ১৩নম্বর বাড়িতে কয়েকটি ঘর ভাড়া নিয়ে সংসার পাতলেন। একই বাড়ির ওপর তলায় দ্বরিকবাবুরা বাস করতেন। ফলে সেসময়কার একজন বিখ্যাত মহিলার সস্নেহ তত্ত্বাবধানে উপেন্দ্রকিশোরের বিবাহিত জীবন শুরু হয়েছিল।

উপেন্দ্রকিশোর ব্রাহ্মকন্যাকে বিয়ে করছেন এবং নিজেও ব্রাহ্মমতে দীক্ষা নিয়েছেন শুনে সারদারঞ্জন খুবই রুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, "ওর বাড়ি থেকে এক টুকরো কাগজও যেন কখনো এ বাড়িতে না আসে।" তাঁর মা জয়তারা কী ভেবেছিলেন তা জানা যায়নি। তবে শ্যামসুন্দর বেঁচে থাকলে তিনি যে তাঁর উদার হৃদয়ে এটা মেনে নিতেন না সে সম্পর্কে অন্যান্য আত্মীয়রা নিশ্চিত ছিলেননা। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে হরিকিশোর খুবই ভেঙে পড়েছিলেন, কিন্তু তিনি উপেন্দ্রকিশোরকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেন নি। যা সেসময় খুবই সাধারণ ঘটনা ছিল। নরেন্দ্রকিশোর কোনদিন তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাননি, এটাই হরিকিশোরের সান্ত্বনা ছিল। এরপর তিনি বাঁচেনও নি বেশিদিন।

সারদারঞ্জন ছিলেন শক্ত ধাতুর তৈরি মানুষ। তিনি তাড়াতাড়ি তৃতীয় ভাই মুক্তিদারঞ্জনের বিয়ে দিয়ে ছিলেন ময়মনসিংহেরেই সুন্দরী কন্যা কুণ্ডলিনীর সঙ্গে। মুক্তিদারঞ্জনের বয়স তখন আঠারো বছর এবং কলেজে পড়ছেন। সবার ধারণা, সব দিক থেকে দুজনের খুব মিল হয়েছিল, আর এই দম্পতি প্রায় সত্তর বছর সুখে কালাতিপাত করেন। স্ত্রী ছিলেন চমৎকার মহিলা, আর মুক্তিদারঞ্জন ছিলেন উচ্চমেধাসম্পন্ন গণিতবিদ - সারাজীবন তিনি লেখাপড়া নিয়ে থেকেছেন, আশির ঘরে যখন তাঁর বয়স তখনও দেখা গেছে গণিতের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করছেন। এটাই ছিল লোকনাথের বংশধারা।

বলা বাহুল্য, ভাইদের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক এত গভীর ছিল যে প্রাথমিক তিক্ততা কয়েক বছর পরই শেষ হয়ে যায়।

# অন্যান্য প্রভাব

রায় পরিবারের কেন্দ্রভূমি এখন কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়েছে। শুধু জয়তারা মসূয়ার পুরনো বাড়িতে বাস করছেন। উত্তর কলকাতায় সারদারঞ্জনের ভাড়াবাড়িটি দূরসম্পর্কের অনেক আত্মীয়ের আশ্রয়স্থল। পড়াশুনা বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে কলকাতা এলে সবাই ওইবাড়িতেই উঠতেন। এদের অনেকেই কোন না কোন সময় উপেন্দ্রকিশোরের আদর্শে প্রভাবিত হয়েছেন। এমনকি ব্রাহ্মসমাজেও এই আগন্তুকটির উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। সাংস্কৃতিক জগতে তাঁর খুবই কদর - একাধারে শিল্পী, গায়ক, লেখক ও সমাজকর্মীর অবস্থান তাঁর মধ্যে। তাঁর সংস্পর্শে এসে প্রভাবিত না হওয়া কঠিন ব্যাপার ছিল। উপেন্দ্রকিশোরের পারিবারিক জীবনের ওপর তাঁর শ্বশুরালয়ের প্রভাব ও উৎসাহ সক্রিয় ছিল।

তাঁর শ্বাশুড়ি কাদম্বিনী সেসময় মুক্ত নারীর আদর্শ হিসেবে ছিলেন। খুব মার্জিত ও সুচারুভাবে তিনি তাঁর সংসারকে গুছিয়ে তুলেছিলেন - এসবই করতেন চিকিৎসাবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত থাকার পাশাপাশি। তাঁর পুত্র ও কন্যারা সবাই ছিলেন চমৎকার। এঁদের মধ্যে জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য, স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। এছাড়া দুর্ধর্ষ সাংবাদিক প্রভাত চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। উপেন্দ্রকিশোর স্বভাবত খুব তেজী পুরুষ ছিলেন না, কিন্তু সচরাচর দেখা যায় না এমন এক শক্তি তাঁর মধ্যে ছিল। মূলত তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিজীবী - রবীন্দ্রনাথ সহ সমস্ত সৃষ্টিশীল শিল্পীরমতো তাঁরও একটা বিচক্ষণ বাস্তবতার দিক ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মেয়েদের শিক্ষার দরকার। এই কারণে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের জন্য তিনি নাটিকা ও গান রচনা করেছেন এবং নিজে তাদের নিয়ে মহড়া দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে চরিত্রগঠনের জন্য নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিহার্য, তাই ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত রবিবারের স্কুলকে নানাভাবে সাহায্য করতেন।

অনেক সুন্দর সুন্দর ভক্তিমূলক গান তিনি রচনা করেছিলেন যেগুলি এখনও গাওয়া হয়। সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বাড়িতে গানবাজনার আসর বসতো। তিনি নিজে দারুণ ভালো বেহালা বাজাতেন। 'বেহালা শিক্ষা' ও 'সংগীত শিক্ষা' নামে যে দুটি বই তিনি পরে লিখেছিলেন সেদুটি এখনও গানবাজনা শেখার মূল্যবান সহায়ক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। স্বরলিপির পদ্ধতি অবশ্য এখন বদলেছে এবং দরকার মতো এদিকওদিক করে নেওয়া হয়েছে। প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ জ্ঞান ঘোষের পিতা দ্বারকানাথ ঘোষের সংগীত সংস্থায় উপেন্দ্রকিশোর একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি একটা সংগীত পত্রিকারও সম্পাদনা করেছেন।

এমন একজন মানুষ তরুণ ও অনুভূতিশীল রবীন্দ্রনাথের নজর এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়, কেননা অন্যদের মধ্যে প্রতিভার সন্ধান তিনি সবসময় করেছেন। ফলে এই দুই মানুষের মধ্যে উষ্ণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেরি হল না। উপেন্দ্রকিশোর ও তাঁর বেহালা ছাড়া জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে কোন গানের জলসা সম্পূর্ণ হতো না। স্থায়ী বন্ধুত্বের স্থায়ী ভিত্তিভূমি হলো দুজনের একই বিষয়গুলিতে আগ্রহ। অন্যভাবে বলতে গেলে, চিন্তাধারা, আদর্শ ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে দুজনেরই উৎসাহ ছিল। এক সাধারণ যোগসূত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় উপেন্দ্রকিশোর ব্রাহ্মদের অনেক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন। নানাভাবে কষ্টস্বীকার করার ফলে প্রথমদিকের ব্রাহ্মদের মধ্যে নমনীয়তার অভাব ছিল এবং পুরনো সমাজ সম্পর্কে তাঁদের সমালোচনা কখনো অত্যুক্তিতে পর্যবসিত হতো। ঠাকুরবাড়ির লোকেরা অবশ্য অনেক পুরনো ধারা বজায় রেখেছিলেন, কিন্তু জীবন সম্পর্কে তাঁদের অনুভূতিপ্রধান আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি কখনো অস্বচ্ছ হয়নি। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবে অনেক তরুণ যেমন পুরনো কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথাগুলি থেকে দূরে থাকতে পেরেছিলেন, তেমনি নব্য-আধুনিকদের বাড়িবাড়িকেও আমল দেননি। ব্রাহ্ম মত কোনো নতুন আবিষ্কার নয়। উপাসনার সময় যেসব মন্ত্র উচ্চারিত হয় সেগুলির প্রায় সবই উপনিষদ থেকে নেওয়া। পুরনো বইপত্রের মধ্যেই এসবের মূল নিহিত আছে। আচরণের শিক্ষাগুলি এসেছে রামায়ন ও মহাভারতের মতো প্রাচীন মহাকাব্য থেকে। উপেন্দ্রকিশোর এসব অধ্যয়ন করেছিলেন - শিশুদের জন্য বইপত্র রচনায় মনোযোগ দেওয়ার আগে, কিছুটা সমালোচকের দৃষ্টিতে হলেও, নানাধরণের পুরাণ যত্ন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়েছিলেন।

শিল্প, সংগীত ও সাহিত্য ছাড়াও তাঁর জীবনের অন্য আরো দিক ছিল। কিছু সমালোচকের ধারণা, উপেন্দ্রকিশোরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে - যেমন ফটোগ্রাফি, ছবি ছাপানো ও মুদ্রণ প্রযুক্তির বিষয়ে। আমাদের দেশে এইসব ক্ষেত্রগুলিতে তাঁকে কমবেশি পথপ্রদর্শক বলা যেতে পারে, কিন্তু তিনি নৈপুণ্যের যে মান প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তা আজও অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব হয়নি। এইসব ক্ষেত্রে অগ্রণী ব্রিটেনেও তিনি স্বীকৃত হয়েছেন। এইসব উচ্চ প্রযুক্তি বিষয়ে রচিত তাঁর প্রবন্ধ সেদেশের উল্লেখযোগ্য পত্রপত্রিকায় গ্রহণ করা হতো ও ছাপা হতো। এইধরনের কাগজগুলির মধ্যে 'পেনরোজেজ'

এর খুব নাম ছিল। যে পদ্ধতিতে তিনি পুরনো হাফ-টোন ব্লকের উন্নতি ঘটান, সেই পদ্ধতি ইংল্যান্ডেও অনুসরণ করা হয়েছিল।

বিজ্ঞানে উপেন্দ্রকিশোরের আগ্রহ ছেলেবেলা থেকেই। তিনি যখন ময়মনসিংহে স্কুলের ছাত্র, তখনও দেখা গেছে, আলোর অদ্ভুত গতিবিধি দেখে তিনি মুগ্ধ হচ্ছেন এবং এ সম্পর্কে হাতের কাছে যে বই পেয়েছেন তাই পড়ছেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় বিজ্ঞানের ক্লাস ও ল্যাবরেটারির কাজ তাঁর চোখ খুলে দিয়েছে। তখনও তিনি ছাত্র, সেসময় তিনি নানা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন, আর এগুলি ছোটদের পত্রিকায় প্রকাশিতও হতো।

বন্ধু ও সঙ্গীসাথীদের তুলনায় তাঁর দুটি মস্ত বড় সুবিধে ছিল। তিনি ছিলেন স্বাধীন, অবস্থাও সচ্ছল। প্রয়োজন হলে ইংল্যান্ড থেকে বই ও অন্যান্য জিনিসপত্র আনাতে পারতেন। যতদিন জীবিত ছিলেন, হরিকিশোর এভাবেই তাঁকে প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন। উপেন্দ্রকিশোরের বি,এ, পাশ করা ও বিবাহের কিছুদিন পরই হরিকিশোর মারা যান, তখন আর সামান্য বাধাটুকুও উপেন্দ্রকিশোরের থাকলো না। তাঁকে আর সংযত হয়েও থাকতে হলো না। শিল্পকর্ম ও গানবাজনায় উৎসাহ এবং নানা বহির্মুখী সমাজসেবামূলক কাজকর্মে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও উপেন্দ্রকিশোর স্বভাবত ছিলেন ভাবগম্ভীর, আদর্শবাদী, পঠনপ্রিয়, এবং কঠোর পরিশ্রমী।

এই সমস্ত চমৎকার গুণগুলি উর্বর ভূমির সংস্পর্শে এসে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছিল। ইংল্যান্ডে ভিক্টোরীয় যুগ তখন মধ্যগগণে. সেখানকার নবোদ্যমের হাওয়া ভারতেও এসে পৌঁছেছিল। জাতীয়তাবোধের নতুন ধারণার অঙ্কুরোদ্‌গমের পাশাপাশি, কিংবা এর ফলাফল হিসেবে, বাণিজ্যিক উদ্যমের ক্ষেত্রে সাহসী পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছিল। দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী দেশের তৈরি কাপড় ও অন্যান্য জিনিশপত্রের উৎপাদন ও বিক্রির জন্য সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন দেশপ্রেমী মানুষেরা। যদিও সরকারী ফেরি ব্যবস্থার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে হয়েছিল, চ্যালেঞ্জটা থেকেই গেল। ভিক্টোরীয় উদ্যম, শক্তি ও দৃঢ়তার গুণগুলি বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পালে নতুন হাওয়া লেগেছিল। এমনকি এখন পর্যন্ত বাংলার দৃঢ় বিবেকবান মানুষদের 'ব্রাহ্মদের মতো আচরণ করছে' বলে ব্যঙ্গ করা হয়। যেন সৎ হওয়া মানেই ব্রাহ্ম হওয়া! ভেবে দেখলে, এটা মস্ত বড় প্রশংসাই বটে। জীর্ণ সমাজের ফাঁকা দম্ভের বিরুদ্ধে যাঁরা লড়াই করবেন, সততাই ছিল তাঁদের আত্মরক্ষার সবচেয়ে বড় বর্ম। উপেন্দ্রকিশোর নিজে যে শহরে বসবাস শুরু করেছিলেন, সে শহরের এরকমই ছিল সামাজিক পরিবেশ।

সব যোদ্ধারাই ব্রাহ্ম ছিলেন না এবং উপেন্দ্রকিশোরের পূর্বপুরুষেরাও সর্বদা সত্য, সততা ও দয়াধর্মে বিশ্বাস করতেন। ফলে নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে উপেন্দ্রকিশোরের অসুবিধে হয়নি। টাকাপয়সার কথা তাঁকে চিন্তা করতে হয়নি।

ময়মনসিংহের জমিদারীর অর্ধেক অংশ থেকেই তাঁর প্রয়োজন মিটতো। হরিকিশোরের নিজের ছেলে নরেন্দ্রকিশোর সম্পত্তির দেখাশোনা করতেন আর উপেন্দ্রকিশোরকে তাঁর প্রাপ্য পাঠিয়ে দিতেন। এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণ ছিলনা উপেন্দ্রকিশোরের। তাই কখনো তিনি দোষ ধরারও চেষ্টা করেননি। নানা লক্ষ্য নিয়ে ব্যাপৃত ছিল তাঁর মনোজগৎ। এইসব লক্ষ্য পূরণের জন্য দীর্ঘ সংগ্রামের জন্যও তিনি প্রস্তুত ছিলেন।

ছোটদের কাগজপত্রে প্রবন্ধ ও গল্প লিখছেন তিনি অনেকদিন ধরেই। প্রবন্ধগুলি প্রায়শই তথ্যমূলক এবং গল্পগুলি তিনি লিখতেন পুরনো কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে। খুব সহজ ছিল তাঁর শৈলী, এবং তাঁর রচনায় গভীর এক রসবোধ কাজ করতো। শীঘ্রই তিনি সেসময়কার শিশুসাহিত্যের একজন উৎকৃষ্ট লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পান। এর ফলে কোন আর্থিক লাভ তাঁর হয়নি, আর সেসময় ছোটদের জন্য যাঁরা লিখতেন, তাঁরা টাকাপয়সার জন্য লিখতে লজ্জাবোধ করতেন।

# মানুষটি

উপেন্দ্রকিশোরের উপস্থিতির মধ্যে এমন একটা কর্তৃত্বের ভাব থাকতো যে লোকেরা তাঁকে গুরুত্ব না দিয়ে পারতেন না। তাঁর আচরণ অবশ্য খুবই অমায়িক ছিল এবং তিনি সহজেই বন্ধু হয়ে যেতে পারতেন। বেশ লম্বা, সুন্দর চেহারা, উজ্জ্বল গায়ের রং আর মুখে পরিপাটি করা দাড়ি। অন্য চার ভাইয়ের মতো তিনি কখনো খেলাধূলায় আগ্রহ দেখান নি। ছেলেবেলা থেকেই অন্য ভাইদের থেকে আলাদা হয়ে মানুষ হওয়ায় সারদারঞ্জনের কোন প্রভাব তাঁর ওপর ছিলনা। তাঁর মস্তিষ্ক সর্বদাই সক্রিয় কিন্তু দৈনন্দিন জীবন ছিল কমবেশি অলসতাময়। মধ্যবয়সে তিনি বহুমূত্র রোগের শিকার হন এবং পঞ্চাশ বছর বয়স পেরোনোর পরই তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু জীবনে তাঁর যে সব দুঃসাধ্য লক্ষ্য ছিল, তার প্রায় সবগুলিই তিনি পূর্ণ করে যেতে পেরেছিলেন। বাংলার মুদ্রণশিল্প ও শিশু-সাহিত্য সেসবের সাক্ষ্য বহন করছে।

একশ বছর আগে তিনি যখন তের নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে বাসা নিয়েছিলেন, তখন সে-জায়গাটা প্রায় স্বর্গের কাছাকাছি বলা যায়। এই বাড়িটি কলকাতার আর সব বাড়ির মতো ছিল না। নীচের তলায় ছিল ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় নামে মেয়েদের জন্য নতুন স্কুল। অনেকগুলি ছোট ছোট পরিবার বাস করতো উপরতলাগুলিতে। উপেন্দ্রকিশোরের দু-তিনটে ঘর দোতলায় আর ভেতরের দিকে ছিল বিশাল বারান্দা। এই বারান্দায় তরুণ লেখক ও শিল্পীদের আসর বসতো। উপেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে সবসময়ই কোন না কোন অতিথি থাকতেন। অতিথিপরায়ণ ও মমতাপূর্ণ হওয়ার জন্য তাঁদের দরজা থেকে গৃহহীন কোন বন্ধুকে ফিরে যেতে হয়নি। একবার এক প্রতিবেশী বন্ধু তাঁর স্ত্রীকে হারিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন, উপেন্দ্রকিশোর তখন সেই প্রতিবেশীর একটি কন্যাকে মানুষ করে তোলার দায়িত্ব নিজের ওপর নিয়েছিলেন। পরে এই মেয়ের সঙ্গে নিজের ছোট ভাইয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। সারাজীবন মেয়েটি উপেন্দ্রকিশোরের দয়া ও মমতার কথা সজল চোখে স্মরণ করেছেন। অনেক ঘটনার মধ্যে এটি একটি মাত্র উদাহরণ, কিন্তু ও থেকেই মানুষটির অন্তরের আভাস পাওয়া যায়। তাঁর স্ত্রীও সর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে নানা কাজে সহায়তা করেছেন। খুব

সাধারণ ছোটখাটো মহিলা, তেমন প্রতিভাও তাঁর ছিল না, কিন্তু নারীসুলভ মহৎ গুণগুলি তাঁর মধ্যে ছিল। কী করে সংসারকে সুখের করা যায় এবং ছেলেমেয়েদের চালাকচতুর ও কর্তব্যপরায়ণ করে তোলা যায় তা তিনি জানতেন। ছেলেমেয়েদের সবার মধ্যেই নানা গুণ পরিলক্ষিত হয়েছিল। এঁদের অনেকেই পিতার মতো সুন্দর চেহারার অধিকারী হয়েছিলেন।

কয়েকবছরের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোরের সংসারের চেহারা বেশ বড় আকার ধারণ করেছে। তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য একটা ডার্করুমের প্রয়োজন হয়েছিল, নিজস্ব ঘরটা ছেড়ে দিয়ে তা করা মুস্কিল ছিল। তাছাড়া ফটোগ্রাফি ও ছাপার কাজের জন্য অনেক বড় বড় যন্ত্রপাতি ইংল্যান্ড থেকে আনানোর অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, সেসব এসে পৌঁছলে বসানোর সমস্যা দেখা দেবে। এই সময়ে নিশ্চয় তাঁর দিনগুলি খুব উৎকণ্ঠায় ভরে উঠতো। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় তিনি যখনই তাঁর বেহালা নিয়ে বাজাতে বসতেন, সব চিন্তা চলে যেতো, একটা সান্ত্বনা খুঁজে পেতেন।

উপেন্দ্রকিশোরের শিশুসাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে আর একজনের নাম অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার। তিনি হচ্ছেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার, বয়সে উপেন্দ্রকিশোরের দু বছরের ছোট, কিন্তু শিশুসাহিত্য প্রকাশনার জগতে উপেন্দ্রকিশোরের চেয়ে বেশ কয়েকবছর আগেই এসেছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। শিশুদের জন্য বই-ই ছিল তাঁর জীবন। পরিবারের ভরণপোষণের জন্য তিনি স্কুলে পড়াতেন, কিন্তু তিনি তাঁর সমস্ত সময় ও যা কিছু সঞ্চয় সব বই প্রকাশনার জন্যে ব্যয় করতেন। ছোট হলেও 'সিটি বুক সোসাইটি' নামে তিনি নিজের একটা প্রকাশনী খুলেছিলেন। এখান থেকেই তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'হাসি ও খেলা' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯১ সালে। রবীন্দ্রনাথ এই বইটিকে ভারতে শিশুগ্রন্থের নতুন যুগের অগ্রদূত বলে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এতদিন পর্যন্ত শিশুদের জন্য বই বলতে তথ্যমূলক ও নীতিকথার বই বোঝাতো, যেগুলি খুব একটা মৌলিক কিছু নয়, পাঠ্যবই হিসেবেই লেখা হতো। যোগীন্দ্রনাথের বইটি একেবারে অন্যরকমের। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দদান ও শিক্ষামূলক কিছু খুঁজে নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া মূলত উদ্দেশ্য ছিল এই বইটির। নতুন শিশুসাহিত্যের প্রধান কথা এখানেই প্রথম প্রকাশ পেল, এই কথাটি হলো আনন্দদানের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা। স্কুল পাঠ্য বই ও খেলার বইয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরির প্রথম চেষ্টাও বলা যায়।

গদ্যে ও পদ্যে যোগীন্দ্রনাথ বেশ কিছু মৌলিক কাহিনী রচনা করেছিলেন, কিন্তু একজন অনুপ্রাণিত সম্পাদক হিসেবেই বেশি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁকে ঘিরে একদল প্রতিভাশালী লেখকেরা ছিলেন যাঁদের একটাই উদ্দেশ্য - শিশুদের প্রয়োজনমতো বই রচনা করা। অনেকসময় গল্প ও কবিতার সঙ্গে লেখকের নাম থাকতো না। এমন কি 'হাসি ও খেলা' বইটিও বিভিন্ন লেখকের রচনার সংকলন। 'খুকুমনির ছড়া' বইটিতে পুরনো ও নতুন অনেক অমূল্য ছড়ার সংগ্রহ পাওয়া যায়। কিন্তু ছড়ার মধ্যে দিয়ে অক্ষর পরিচয়ের বই 'হাসিখুসি'

যোগীন্দ্রনাথের নিজের রচনা, এমন বই আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি। ঠিক একই ধরনের আর একটি বই রচনার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথও করেন নি। তাঁর অসাধারণ শিশুগ্রন্থ 'সহজ পাঠ' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের শুরুতে তিনি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে শিশুরা অক্ষর পরিচয়ের পরই এই বই পড়বে। যোগীন্দ্রনাথের প্রকাশিত বইগুলির অলঙ্করণ মৌলিক ছিল না, সাজসজ্জা সাধারণ, ব্লকের কাজ খুব সূক্ষ্ম নয়, দামও ছিল কম, কেননা বেশি লোকে এগুলি কিনতে পারবে। তখনকার দিনের বাবা-মায়েরা ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য বেশি পয়সা খরচ করতে রাজী ছিলেন না। চিরস্থায়ী সম্পদ সোনার বালা কেনা যায়, কিন্তু দুদিন পর নষ্ট হয়ে যাবে এমন বই তাঁরা কিনবেন কেন!

যোগীন্দ্রনাথ নির্ভয়ে তাঁর প্রকাশনার কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্খীরা তাঁকে বড়ভাই বিশিষ্ট চিকিৎসক স্যর নীলরতন সরকারের সঙ্গে তুলনা করে ছোট করতো। তাদের বক্তব্য ছিল, অলাভজনক কাজ করে যোগীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন অপচয় করছেন। আজ যাট বছর পর নীলরতনের নাম প্রায় বিস্মৃত, কিন্তু প্রত্যেক বাংলাভাষী শিশু যোগীন্দ্রনাথের নাম জানে।

বাংলায় শিশুসাহিত্যের উদ্গাতা হিসেবে সাধারণত উপেন্দ্রকিশোর ও যোগীন্দ্রনাথের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। কিন্তু সত্যি কথা হলো, উপেন্দ্রকিশোরের মেধা, মৌলিকতা ও নানামুখী প্রতিভা যোগীন্দ্রনাথের না থাকলেও বাংলা শিশুসাহিত্যের পথ তাঁর কাছ থেকেই শুরু তাতে সন্দেহ নেই।

উপেন্দ্রকিশোরে প্রথম বই দুটি - 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' যোগীন্দ্রনাথের সিটি বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং আগ্রহী পাঠকেরা বইদুটিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ছোটদের উপযোগী করে অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী এই বই দুটিতে বলা হয়েছে। উপেন্দ্রকিশোরের কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর দারুণ দারুণ ছবিগুলির মুদ্রণ দেখে। তিনি অবশ্য বুঝতে পারলেন যোগীন্দ্রনাথের মুদ্রক ও ব্লকমেকারদের দিয়ে এর চেয়ে ভালো করা সম্ভব নয়।

এরপর তিনি তাঁর আর কোন বই অন্য প্রকাশকের কছে থেকে ছাপেননি। তিনি নিজেই সেগুলি প্রকাশ করেছেন। নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন তিনি আর তাঁর কাজের ফলে বাংলায় মুদ্রণ ও ফটো এনগ্রেভিং-এর কাহিনীতে নতুন পরিচ্ছেদের সূচনা হয়েছে।

# আর এক প্রজন্ম

কোন মানুষের বাইরের জগতের কাজকর্ম যতো উচুঁ পর্যায়েরই হোক না কেন, তা দিয়ে মানুষটির গোটা জীবনটাকে বোঝা যায় না। ব্যক্তিগত জীবনও সমান গুরুত্বপূর্ণ - তাঁর কৃতিত্বে এই জীবনেরও অবদান থাকে। বিবাহের কয়েক বছরের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর একজন প্রতিভাবান তরুণ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। পুরনো সমাজের ধ্বংসাবশেষের ভিতর থেকে যে নতুন সমাজ বেরিয়ে আসছে, সেই সমাজকে একটা চরিত্র দিতে চাইছিলেন এমন তরুণেরাই। নিজের নিজের কাজে মধ্যে দিয়ে তাঁরা প্রত্যেকেই একএকজন দেশপ্রেমিক। এঁরা রাজনীতির মধ্যে যাননি, কিন্তু এঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল উচ্চ চারিত্র্যযুক্ত একটা সবল জাতিগঠন। এটা তাঁরা করতে চাইছিলেন ভারতীয় পদ্ধতিতে - রক্ষণশীল উপায়ে নয়, ভিক্টোরীয় সমাজ থেকে বাস্তব শিক্ষাগুলিকে গ্রহণ করেই। লন্ডনকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিলেন যে ভিক্টোরীয় যুগের বিখ্যাত মহিলারা, তাঁদের মতোই সাহসী ও যোগ্য হতে পেরেছিলেন আমাদের শিক্ষিত ও মুক্তিপ্রাপ্ত ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান ও হিন্দু নারীরা।

আমাদের নারীদের কাছে এটা একটা বিরাট পদক্ষেপ ছিল। কেননা সেসময় বাইরে বেরোবার উপযুক্ত পোশাক পরিচ্ছদ পর্যন্ত মেয়েদের ছিল না। মেয়েরা সবাই তখন সেলাই-না-করা একখন্ড সূতীর কাপড় কিংবা সিল্কের শাড়ি গায়ে জড়িয়ে ভদ্রতা রক্ষা করতেন - কোথাও দেখা করতে গেলে কিংবা মন্দির ইত্যাদি জায়গায় যেতে হলে ঢাকা পাল্কি বা গাড়িতে করে এই পোশাকেই যেতেন।

এই ব্যাপারে ঠাকুর পরিবারের লোকজন অগ্রণী শক্তি হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁরা মেয়েদের উপযোগী কার্যকর ও সুন্দর পোশাকের উদ্ভাবন করেছেন। ভিক্টোরীয় পোশাকের মতো করে সায়া ব্লাউজ, পার্সীদের মতো করে শাড়ি পরা (কিন্তু বাঁ কাঁধে পিন দিয়ে আঁচল আটকানো হতো কিছুটা স্বকীয়তার জন্য, আর কিছুটা ডান হাতের বেশিটা মুক্ত রাখার জন্য) ইত্যাদির চল্ শুরু হয়। এঁদের মেয়েরা লম্বা মোজা ও জুতো পরতেন বাইরে বেরোনোর সময়। সমাজে এই পোশাক মেনে নেওয়া হয়েছিল - কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও চন্দ্রমুখী বসু এভাবেই

পোশাক আশাক করতেন। উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ির মেয়েরা কমবেশি একই ধরণের পোশাক পরতেন। জুতো ও মোজা সবসময় পরা হতো না, বিশেষত অনুষ্ঠানে যেতে হলে পরা হতো। ছোট মেয়েরা অবশ্য খালি পায়েই স্কুলে যেতো। এটা মনে রাখা দরকার যে ভদ্রপরিবারের মেয়েরা তখন রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত ছিলেন না। বিবাহিতা মেয়েরা তখন মাথায় ঘোমটা দিতেন। স্ত্রী ও কন্যারা কী ধরনের পোশাক পরছেন সে ব্যাপারে উপেন্দ্রকিশোরকে খুব সতর্ক থাকতে হতো, কেননা জনমতের সঙ্গে মানিয়ে চলার প্রয়োজন ছিল। প্রসাধনের কথা তখন শোনা যায়নি। রক্ষণশীল বাঙালী পরিবারের মহিলা ও বালিকারা নাচ, গান বাজনা ইত্যাদিও করতেন না। এসব ব্যাপার একমাত্র পেশাদারী মহিলাদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে ঠাকুর বাড়ির লোকেরাই পুরো অবস্থাটিকে বদলে দেন। তাঁদের উদ্যোগে মেয়েদের স্কুলে গান শেখানো শুরু হয়েছে। উপেন্দ্রকিশোরের কন্যাদের গান শেখানো হতো, কিন্তু নাচ শেখানো হয়নি।

স্কুলের মেয়েদের গানবাজনা শেখানোয় উপেন্দ্রকিশোরের খুব আগ্রহ ছিল। ছেলেমেয়েদের জন্য সহজ কথা ও সুন্দর সুর দিয়ে অনেক ভালো ভালো গান তিনি রচনা করেছিলেন। বার্ষিক ব্রাহ্ম মাঘোৎসবের সময় যখন শিশুদিবস উদযাপন করা হতো, তার জন্য তিনি ছোটদের নিয়ে গানের রিহার্সাল দিতেন। তাঁর নিজের ছেলেমেয়েরা সবাই গান গাইতে পারতেন। মেয়েরা সবাই স্কুলে যেতেন। এঁদের প্রত্যেকেরই সাহিত্যের মেধা ছিল, বড় ছেলে ও মেয়ে আঁকতেনও। সাধারণ উদারনৈতিক শিক্ষায় উপেন্দ্রকিশোরের বিশ্বাস ছিল, এই কারণে তিনি সময়করে ছেলেমেয়েদের সবাইকে নিয়ে যেতেন স্বদেশী মেলায়, যা তখন মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হতো। শিল্পবিষয়ক ষ্টলগুলিতে তাদের নিয়ে যেতেন, সেখানে নানা কারিগরী উদ্ভাবনগুলি দেখানো হতো। ছেলেমেয়েদের তিনি সব খুঁটিনাটি বিষয় বুঝিয়ে বলতেন, তাই শুনতে লোকেরাও হুমড়ি খেয়ে পড়তো। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তিনি আর পাঁচজন পিতার মতো ব্যবহার করতেন না। সবকিছু বুঝিয়ে বলতেন, এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি।

সন্ধ্যাবেলায় বাড়িতে অবসর পেলে তিনি তাদের গল্প বলতেন এবং প্রাকৃতিক জগৎ ও বিশ্ব সম্পর্কে নানা বিস্ময়কর কথা শোনাতেন। তাঁর একটা শক্তিশালী দূরবীণ ছিল। তার সাহায্যে তিনি ছেলেমেয়েদের চাঁদের পাহাড় দেখাতেন, গ্রহ-তারা চেনাতেন। উদ্ভিদ ও প্রাণীদের সম্পর্কে ইংরাজীতে নতুন নতুন বই বেরোনোমাত্র তিনি কিনে আনতেন এবং তাদের পড়ে বুঝিয়ে দিতেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে তাঁর বাড়িটা ছোট ক্লাব হয়ে উঠেছিল। কখনো কখনো চড়ুইভাতির আয়োজন করা হতো এবং ছেলেমেয়েদের গ্রামাঞ্চলের দিকে নিয়ে যাওয়া হতো। বোটানিক্যাল গার্ডেন, যাদুঘর ও চিড়িয়াখানায় যাওয়ার অভিজ্ঞতা যেসব সৌভাগ্যবান ছেলেমেয়েদের হয়েছিল, তারা তা কখনো ভুলতে পারেনি। এ সবকিছুকেই তিনি শিক্ষার অঙ্গ বলে মনে করতেন। কেননা এইভাবে শিশুদের মনের চোখ খুলে যায়। তাঁর নিজের ছেলেমেয়েরা ও আর যারা তাঁর তত্ত্বাবধানে থেকেছে, এই উদারনৈতিক শিক্ষা তারা

পেয়েছে এবং তার সুফল পেয়েছে। যত ভালো বাংলা বই পাওয়া গেছে, সব তিনি শিশুদের পড়তে দিয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে ভালো বাংলা বইয়ের সংখ্যা সত্যিই খুব কম।

এসবের পাশাপাশি তাঁর মনের ভিতরে নিজস্ব একটা প্রকাশনী সংস্থা খোলার পরিকল্পনা কাজ করে যাচ্ছিল। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য তিনি অর্ডার দিয়েছিলেন কিন্তু সেগুলি বসানোর জায়গা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁকে ১৩ নম্বর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়ি ছেড়ে বড় বাড়ির খোঁজ করতে হবে। তাঁর ছেলেমেয়েরা সর্বদাই এই পুরনো বাড়িটির কথা স্মরণে রেখেছিল। একটা বাড়ি শুধু নয়, একটা পুরো বসতি - নীচে স্কুল, ওপরে বিশাল ছাদের খেলার মাঠ। ভালো বন্ধু বা সঙ্গীর খোঁজে কাউকে দূরে যেতে হতো না, ওই বাড়িতেই প্রত্যেকের সঙ্গী জুটে যেতো। বাড়ির পাশে ফাঁকা জায়গা ছিল, প্রত্যেকবছর শীতে সেখানে সার্কাসের দল তাঁবু ফেলতো। ছেলেমেয়েরা সার্কাসের লোকেদের ব্যক্তিগত জীবন ও জীবজন্তুদের সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারতো। বাড়ির উপরের তলায় দাদুর পরিবার, বড় বড় ঘর নিয়ে দ্বারিকবাবু ওপরে বাস করতেন। নীচেও আরো একটা পরিবার বাস করতেন, পোষা কচ্ছপ ছিল তাদের চৌবাচচায়। এইরকম একটা বাড়ি ছেড়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের কাছে সতিই কষ্টের ছিল।

খুব একটা দূরে নয়, উপেন্দ্রকিশোর নতুন বাড়ি নিলেন সংকীর্ণ শিবনারায়ণ দাস লেনে। মাঝারি আকারের গোটা বাড়িটাই তিনি ভাড়া নিয়েছিলেন। পাঁচ ছেলেমেয়ে নিয়ে বড় সংসার, তার ওপর ষষ্ঠজন হাজির হয়েছে সম্প্রতি। এছাড়া ছিল বন্ধুর ছোট মেয়েটি, বড় মেয়ের চেয়ে এক বছরের বড় এই মেয়েটিকে উপেন্দ্রকিশোর নিজের ছেলেমেয়ের সঙ্গেই মানুষ করেছেন। তারপর ছিল তাঁর স্ত্রীর অসুস্থ ভাই, আর উপেন্দ্রকিশোরের চতুর্থ ভাই কুলদারঞ্জন, যিনি তখন স্কুলের পড়াশুনা শেষ করে আর্টস্কুলে ভর্তি হয়েছেন।

নতুনবাড়ির একটা ঘর তাঁর স্টুডিওর জন্য নির্ধারিত হলো। বাড়তি স্নানের ঘরটি হলো ডার্করুম। অন্য একটি ঘরে ছোট প্রেস বসানো হয়েছে। নানা যন্ত্রপাতি ও জিনিশপত্র বারান্দায় সাজিয়ে রাখা হলো এমনভাবে যাতে পরিবারের থাকার জায়গা থেকে আর কোন অংশ ছাড়তে না হয়।

যন্ত্রপাতি বিলেত থেকে এসেছে , এগুলি ব্যবহারের পদ্ধতিও সংগ্রহ করা হয়েছে, এবং উপেন্দ্রকিশোরের এক দৃঢ় পদক্ষেপের আকাঙ্খা বাস্তবায়িত হলো ১৮৯৫ সালে। আর স্বীকৃতিও জুটলো সঙ্গেসঙ্গেই।

# ইউ. রে এ্যান্ড সন্স

ছোট প্রকাশন সংস্থাটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'ইউ রে এ্যান্ড সন্স'। রে অর্থাৎ রায়। সালটা ছিল ১৮৯৫। একটা প্রকাশনী ভালোভাবে শুরু করতে যে ধারণা থাকা দরকার, উপেন্দ্রকিশোরের তা ছিল। যা ছিল না তা হলো অভিজ্ঞতা, এটা পূরণ করে নিতে তিনি দেরি করলেন না। 'সেকালের কথা' নামে লুপ্ত জীবজন্তুদের সম্পর্কে অলঙ্করণসমৃদ্ধ তাঁর একটা ছোট বই বেরোলো। পুরনো বাড়িতে থাকার সময় সন্ধ্যাবেলায় যখন সব ছেলেমেয়েরা তাঁকে ঘিরে বসতো, তিনি তখন তাদের নানা গল্প বলতেন - মানুষের আধিপত্য শুরু হওয়ার আগে পৃথিবীতে কেমন বিশাল জন্তুজানোয়ারেরা ঘুরে বেড়াতো, তার গল্প, ডাইনোসর, টাইরানোসর ইত্যাদি ও দৈত্যকায় মাছেদের গল্প। তিনি লক্ষ করতেন যে ছেলেমেয়েরা কী গভীর আগ্রহ নিয়ে এইসব গল্প শুনছে।

সব ভালো লেখকদের মতো ভালো সম্পাদকও একটা ষষ্ঠইন্দ্রিয় নিয়ে জন্মান। তিনি বুঝতে পারেন তাঁর কী করা দরকার এবং তিনি সেইমতো কাজ করেন। উপেন্দ্রকিশোর জানতেন যে ছেলেমেয়েদের ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। তাদেরকে যা দেওয়া হচ্ছে, সেটা তারা উপভোগ করতে পারলে তবেই তাদের মনের ওপর তার ছাপ পড়বে। বিষয়বস্তু তেমন বড় কথা নয়, সেই বিষয়টিকে কীভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে সেটাই বড় কথা। শিশুসাহিত্যের প্রায় সব নিষ্ঠাবান লেখকেরাই দারুণ দারুণ বিষয় নির্বাচন করেন, কিন্তু ছেলেমেয়েরা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবে এমনভাবে উপস্থাপিত করতে পারেন না। বিষয়টিকে গল্পের মতো হতে হবে। এর মানে এই নয় যে সম্পূর্ণ অবাস্তব গল্প ফাঁদতে হবে তাদের আকর্ষণ করার জন্য। শিশুদের জন্য কোন রচনায় অপ্রাসঙ্গিক কিছু বরং নিয়ে আসাই উচিত নয়। প্রয়োজনীয় বিষয় থেকেই অনেক সাহিত্যের উপকরণ পাওয়া যায়। আর সেই উপকরণগুলিকে সরাসরি, সহজ, প্রাণবন্ত ও কথোপকথনের ঢঙে পরিবেশন করা দরকার। শিশুদের মন অনুসন্ধিৎসায় ভরা, তাদের ধরনটাই সরাসরি। উপেন্দ্রকিশোর জানতেন যে, ত্রুটিগুলি তাঁকে এড়াতে হবে। কোনকিছু সরাসরি বলতে হবে, কিন্তু একঘেঁয়ে হলে চলবে না।

লেখককে সতেজ কল্পনার অধিকারী হতে হবে। তাঁর কথার মধ্যে দিয়ে ছবি ফুটে উঠবে, আর বলার ভঙ্গিটি হবে সরস।

এই ছবির ভাষার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো 'সেকালের কথা'। ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এর সব কপি শেষ হয়ে যায়। বাবা-মা'রা এটা বুঝতে পারলেন যে বইপড়ার ব্যাপারটিকে ছেলেমেয়েরা উপভোগ করলে শিক্ষা জিনিসটা খুব সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যায়। আধুনিক শিশুগ্রন্থ-প্রণেতারা (যথার্থ অর্থে এঁরা সবসময় লেখক নন) নানাধরনের সত্যিকার ছবির সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করেন। এমনকি এও বলা হয়ে থাকে যে ছোটদের বইয়ে মূল পাঠ্যাংশের চেয়ে বেশি অলঙ্করণ থাকা উচিত। সদ্য পাঠ শুরু করছে এমন শিশুদের ক্ষেত্রে কিছুটা সত্যি। কিন্তু ছবির সাহায্যে গল্প বলার ওপর এখন যে অত্যধিক জোর দেওয়া হচ্ছে, তার ফলে শিশুদের সাহিত্য বোঝার ক্ষেত্রে মারাত্মক ফল ঘটছে। উপেন্দ্রকিশোরের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

তাঁর প্রথম তিনটে বই - 'রামায়ণ', 'মহাভারত' ও 'সেকালের কথা' এখনও অর্থাৎ আত্মপ্রকাশের প্রায় একশ বছর পরেও খুবই জনপ্রিয় হতে পারতো, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে এগুলির ক্ষেত্রে সমস্যা থেকে গেছে। এগুলির ভাষা সহজ হলেও কেতাবী ধরণের - বোঝার পক্ষে খুবই সহজ, কিন্তু এগুলির মধ্যে আধুনিক বাংলা শিশুসাহিত্যের যে সৌন্দর্য, সেই ব্যক্তিগত সহজতা নেই। ক্রিয়াপদের কিছু অদলবদল ঘটালে অবশ্য এই সহজতা ফিরে আসবে। এগুলি লেখার আগে উপেন্দ্রকিশোর যদিও কিছু কিছু রচনায় কথ্যভাষা ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু ছোটদের পত্রপত্রিকার সম্পাদকরা সেসব তেমন সুনজরে দেখেননি।

তবে ১৯১০ সালে প্রকাশিত তাঁর 'টুনটুনির বই' এখন বাংলাভাষায় শিশুদের ভালো বইগুলির অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। বইটির অসংখ্য মুদ্রণ হয়েছে এবং মূল বইটিকে এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কারণ হলো উপেন্দ্রকিশোর এখানে শিশুদের ও মধ্যবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন মুখের ভাষা ব্যবহার করেছেন। 'টুনটুনির বই' ১৯১০ সালের না হয়ে ১৯৮০ সালের লেখাও হতে পারতো।

অনেক পুরনো গল্প ও লোকগাথার সংকলন এই বইটি। ময়মনসিংহের মা ও ঠাকুমারা একসময় এইসব গল্প শোনাতেন - রাতের খাবার তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এই গল্প শুনিয়ে তাদের জাগিয়ে রাখা হতো। গ্রন্থটি সত্যিই এক অসাধারণ কৃতিত্বের নিদর্শন। গল্পগুলি মৌলিক নয়, কিন্তু কালোত্তীর্ণ হয়ে আছে - স্নেহে কোমল, রসে টইটম্বুর। এগুলির মধ্যে দিয়ে বাংলার গ্রামজীবনকে উঁকি মেরে দেখা যায়, এ দেখা অনন্তকালের। বইটির প্রথম গল্পটি এখানে উদ্ধৃত করলে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

গল্পটির নাম 'টুনটুনি আর বিড়ালের কথা'। গল্পটি শুরু হয়েছে এইভাবে ঃ

"গৃহস্থের ঘরের পিছনে বেগুন গাছ আছে। সেই বেগুন গাছের পাতা ঠোঁট দিয়ে সেলাই করে টুনটুনি পাখিটি তার বাসা বেঁধেছে।

বাসার ভিতরে তিনটে ছোট্ট ছোট্ট ছানা হয়েছে। খুব ছোট্ট ছানা, তারা উড়তে পারেনা, চোখও মেলতে পারেনা। খালি হাঁ করে আর চীঁ-চী করে।

গৃহস্থের বিড়ালটা ভারি দুষ্টু। সে খালি ভাবে 'টুনটুনির ছানা খাব।'

একদিন সে বেগুন গাছের তলায় এসে বললে, কি করছিস লা টুনটুনি?'

টুনটুনি তার মাথা হেঁট করে বেগুন গাছের ডালে ঠেকিয়ে বললে, 'প্রণাম হই, মহারাণী!'

তাতে বিড়ালনী ভারি খুশি হয়ে চলে গেল।

এমনি সে রোজ আসে, রোজ টুনটুনি তাকে প্রণাম করে আর মহারাণী বলে, আর সে খুশি হয়ে চলে যায়।

এখন টুনটুনির ছানাগুলি বড় হয়েছে, তাদের সুন্দর পাখা হয়েছে। তারা আর চোখ বুঁজে থাকে না। তা দেখে টুনটুনি তাদের বললে. 'বাছা. তোরা উড়তে পারবি?

ছানারা বললে, 'হ্যাঁ মা, পারব।'

টুনটুনি বললে. 'তবে দেখ তো দেখি, ঐ তালগাছটার ডালে গিয়ে বসতে পারিস কি না।'

ছানারা তখনই উড়ে গিয়ে তাল গাছের ডালে বসল। তা দেখে টুনটুনি হেসে বললে. 'এখন দুষ্ট বিড়াল আসুক দেখি।'

খানিক বাদেই বিড়াল এসে বললে. 'কি করছিস লা টুনটুনি?'

তখন টুনটুনি পা উঠিয়ে তাকে লাথি দেখিয়ে বললে, 'দূর হ, লক্ষ্মীছাড়ী বিড়ালনী!' বলেই সে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাল।

দুষ্টু বিড়াল দাঁত খিচিয়ে লাফিয়ে গাছে উঠে. টুনটুনিকেও ধরতে পারল না. ছানাও খেতে পেল না। খালি বেগুন কাঁটার খোঁচা খেয়ে নাকাল হয়ে ঘরে ফিরল।"

আর সব প্রাচীন কাহিনী ও লোকগাথার মতো এই ছোট্ট বইটিও চিরকালের বিষয়কে অবলম্বন করেছে, ফলে গল্পগুলি কখনো পুরনো হবার নয়। গল্পগুলির মধ্যে একধরণের রসবোধ কাজ করেছে, আর প্রতিটি গল্পেই একটি নীতিকথা আছে, কিন্তু তা এত শিল্পসম্মত ভাবে আনা হয়েছে যে খুব অচেতনভাবেই সেটি জানা হয়ে যায়।

গল্পগুলির পরিবেশ তৈরি হয়েছে ময়মনসিংহের গ্রাম, নদী, পুকুর ও জঙ্গলকে ঘিরে। চরিত্রগুলি হলো হাতি, বাঘ, কুমির, শেয়াল ও অন্যান্য প্রাণী, পাখি এবং ময়মনসিংহের গ্রামবাসীরা। কিন্তু গল্পগুলি হয়ে উঠেছে সব জায়গার, সব সময়ের।

উপেন্দ্রকিশোর 'আকাশের কথা' নামে আর একটা বইয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন। বইটি লেখার জন্য তিনি অনেক উপকরণও সংগ্রহ করেছিলেন এবং পত্রপত্রিকায় নিবন্ধও লিখেছিলেন। তাঁর চারপাশে যেসব ছেলেমেয়েরা থাকতো, তাদের তিনি আকাশের রহস্যময়তার কথা শোনাতেন এবং তাঁর শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে তাদের দেখাতেন চাঁদের পাহাড় ও শনি-বলয়। বইটি তবুও বেরোয় নি, হয়তো এ কারণে যে বিজ্ঞানের যেসব তথ্য ও পরিসংখ্যান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, তা শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণ মনে হয়নি তাঁর।

১৯০১ সাল নাগাদ দেখা গেল তাঁর ক্রমবর্ধমান ছাপাখানার কাজ ও পরিবারের থাকার পক্ষে শিবনারায়ণ দাস লেনের ছোট বাড়িটা যথেষ্ট হচ্ছে না। তখন তাঁরা ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে উঠে গেলেন এবং সেখানে বাস করলেন ১৯১৩ সালের শেষ নাগাদ। তারপর শেষবারের মতো সেখান থেকে উঠে যান নিজেদের মনোমত করে বানানো ১০০ নম্বর গড়পার রোডের বাড়িতে। খুব বড় করে ইউ রে এ্যান্ড সন্স লেখা হয়েছিল বাড়ির গায়ে। দুটো তলারই সামনের ঘরগুলোকে ছাপাখানা ও অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল আর পেছনের দিকে নিজেদের বাসস্থান, এবং সবচেয়ে পেছনে একটা ছোট বাগান।

বাংলায় বারো বছরকে একযুগ হিসেবে ধরা হয়। সেই অনুযায়ী উপেন্দ্রকিশোর ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে বাস করেছিলেন এক যুগ। সবার দৃষ্টি ছিল উপেন্দ্রকিশোরের দিকে, যিনি একটা ঐতিহ্য তৈরি করছিলেন তাঁর কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে। সবাই দেখতো, দোতলায় একজন সুদর্শন মানুষ বেহালা বাজান, দারুণ ছবি আঁকেন, আর বিশাল বিশাল যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিস্ময়কর সব ছাপার কাজ করেন। স্বর্গীয় সুনির্মল বসু গল্প করতেন যে পাড়ার ছেলেমেয়েরা রাস্তার দিকের একটা জানলার সামনে ভিড় করতো দিনের একটা সময়ে এবং বাতিল করে দেওয়া রঙীন ছবি চেয়ে নিতো। মুখে বিরক্তির ছাপ নিয়ে ভালোমানুষ গোছের একজন প্রত্যেককে একটা করে ছবি বাড়িয়ে দিতেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, সবগুলি একই ছবি, কিন্তু নানারঙে ছাপা - একমাত্র রামধনুর মধ্যেই এতসব রং দেখতে পাওয়া যায়। কখনো দুটো রঙেও একটা ছবি ছাপা হতো, একটার ওপরে আর একটা, তাতে তৃতীয় একটা রং বেরিয়ে আসতো। খুবই অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার ছিল এসব আর তাই বাড়িটার কথা সবার মুখেমুখে ঘুরতো।

বাড়ির বাসিন্দারাও অন্যান্য মানুষদের থেকে আলাদা। এমনকি বাড়ির মেয়েরা স্কুলে যায়, কলেজে যায়। বাড়িতে পুজোও হয় না, কেননা ব্রাহ্ম হওয়ার জন্য তাঁরা সবাই ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনালয়ে যেতেন। কয়েক দশকের মধ্যে কলকাতার বাসিন্দারা ব্রাহ্মদের সম্পর্কে ও তাঁদের রীতিনীতি সম্পর্কে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। বস্তুত, অনেক উদার হিন্দুও ব্রাহ্মদের মতো আচরণ করতেন, ফলে বাইরে থেকে কোন বিশেষ পার্থক্য চোখে পড়তো না।

# মুদ্রণে দৃপ্ত পদক্ষেপ

নিজে ছাপার কাজ শুরু করার অনেক আগেই উপেন্দ্রকিশোর ব্রিটিশ মুদ্রক ও এনগ্রেভারদের কাজকর্ম ভালোভাবে চর্চা করেছিলেন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম কিনে নিজে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তারপর সময় হলে তবেই নিজে কাজে এগিয়েছেন। দীর্ঘদিনের চর্চা ও নিরীক্ষা থাকার জন্যেই তিনি এত সহজে তাঁর এই নতুন পদক্ষেপে সাফল্য লাভ করতে পেরেছিলেন। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দিকে কোন সহজ রাস্তা নেই। অনেক বাধা ও পতনের সম্ভাবনাযুক্ত এ এক দীর্ঘ শ্রমময় পদযাত্রা। সব বিজ্ঞানীদের মতোই উপেন্দ্রকিশোরকে তাঁর নির্ধারিত পথে এগোতে হয়েছে বাধা অতিক্রম করেই। এ সম্পর্কে সাধারণ লোকের কোন ধারণা ছিলনা। এখনও তিনি উচ্চপ্রতিভাসম্পন্ন বিজ্ঞানের একজন মানুষ এই পরিচয়ের চেয়ে যুগান্তকারী লেখক ও শিশুদের বইয়ের প্রকাশক এই পরিচয়েই বেশি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

ব্রিটেনের মুদ্রণ প্রযুক্তির জগতে কিন্তু তাঁকে একজন মৌলিক বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল তাঁর অবদানের জন্য। একশ বছর আগে, রাণী ভিক্টোরিয়া তখনও জীবিত, সাম্রাজ্যের প্রসার, রাজনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন ও প্রয়োগ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড সবার চেয়ে এগিয়েছিল। সেইসময় উপেন্দ্রকিশোর হয়তো পেনরোজেস এ্যানুয়াল- এর সম্পাদকমন্ডলীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। নিজেদের কাজকর্মে যতই গর্বিত ও অহংকারী হোক না কেন ইংরাজরা অন্যের প্রশংসা করতে জানতেন ও উৎসাহ দিতেন। খুব শীঘ্রই উপেন্দ্রকিশোর তাদের কাছে বন্ধুত্বের অভ্যর্থনা পেলেন। একথা অবশ্যই বলা যায় এবং পেনরোজেস পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে তার উল্লেখ আছে যে সম্পাদকমন্ডলীর সঙ্গে নিকট সম্পর্ক তৈরি হওয়ার আগেই একজন বিজ্ঞানী উপেন্দ্রকিশোরের প্রশংসা করেছিলেন তাঁর উদ্ভাবনগুলির জন্য এবং সেগুলি নিজের কাজে লাগিয়েওছিলেন। উপেন্দ্রকিশোর এ সম্পর্কে বলেছিলেন যে ফটো-এনগ্রেভিং মুদ্রণপ্রযুক্তির উন্নতিই তাঁর একমাত্র কাম্য, তাঁর পদ্ধতিকে ব্যবহার করছে এবং সফলতা লাভ করছে সে সম্পর্কে তিনি কিছু মনে করেন না।

'পেনরোজেস' এ সবকিছুই প্রকাশিত হতো, এমনকি তাঁর ওই বিবৃতি পর্যন্ত। তাঁর প্রবন্ধগুলিতে নানা নক্সা ও অলঙ্করণ প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা হতো। আর যে অসাধারণ ভাষায় সেগুলি লেখা হয়েছিল সে সম্পর্কে কারো কিছু বলা ছিল না। যখন মনে করি এই সেই ময়মনসিংহ স্কুলে পড়া গ্রাম্য বালক যিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এসেছিলেন, তখন অবাক না হয়ে পারি না কী করে তিনি এত সুন্দর ও নিখুঁত বাক্‌ধারা এবং ভাষার এমন স্বাচ্ছন্দ্য রপ্ত করেছিলেন। কলকাতা আসার আগে ইংরাজদের সংস্পর্শে তেমনভাবে এসেছিলেন সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি ব্রিটিশ অধ্যাপকদের কাছে পড়েছিলেন। কিন্তু তা দিয়ে তাঁর সুন্দর ভাষাগুণের ব্যাখ্যা করা যায় না, 'পেনরোজেস'-এর লোকজন তাঁর লেখার ঈষৎ পরিবর্তন করে নিতেন এমন ভাবলেও নয়।

এমন অনেক প্রবন্ধ আমাদের কাছে আছে। এগুলির বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ কারিগরি বিষয়ক এবং সাধারণ অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে বোঝা মুস্কিল। আসলে এগুলি লেখাই হয়েছিল বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞদের জন্য এবং 'পেনরোজেস' পত্রিকাটিও বিশেষজ্ঞদের জন্যই প্রকাশিত হতো। উপেন্দ্রকিশোরের প্রবন্ধগুলি উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথম বছরগুলিতে ছাপা হয়েছিল। যেসব বিষয় এগুলিতে আলোচিত হয়েছিল সেগুলির দ্বারা ভারতে কয়েক প্রজন্মের মুদ্রক ও ফটো-এনগ্রেভারদের শিক্ষার-ক্ষেত্রে অশেষ উপকার সাধন করা হয়েছে। কেবল ভারতে নয়, ১৯১১ সালে যখন উপেন্দ্রকিশোরের জ্যেষ্ঠপুত্র সুকুমার ফটোগ্রাফি ও ছবি ছাপা সম্বন্ধে আরো শিক্ষালাভের আশায় বিলেতে গিয়েছিলেন তখন সেখানে উপেন্দ্রকিশোরের নিয়মে হাফ-টোনের কাজ হতে দেখে এসেছিলেন।

উপেন্দ্রকিশোরের কিছু প্রবন্ধের নাম ও অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করা আশাকরি ভুল হবে না। একটি প্রবন্ধের নাম 'দি হাফ-টোন থিয়োরি গ্রাফিক্যালি একসপ্লেইন্‌ড ঃ মালটিপ্‌ল স্টপ্‌স' - এখানে লেখক বলেছেন, "সাধারণভাবে একটা হাফ-টোন নেগেটিভ তৈরি করতে গিয়ে থেকে থেকেই নানাধরণের আলোক-সম্পাতের দরকার হয় ... এই সব এক্সপোজার বা আলোক সম্পাতের জন্যে অনেক সময় লাগে, যার অর্থ সবাই জানে যে বেশি টাকাখরচ। সুতরাং এই সময় কম লাগানোর ব্যবস্থা করতে পারলে ছবি ছাপানোর খরচ অনেক কমে যাবে। ছেদগুলিকে কমানো যায় এবং ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারলে এই ছেদগুলির সাহায্যে এইসব আলোকসম্পাতগুলিকে পাশাপাশি নিয়ে যাওয়া যায় যাতে একটা নেগেটিভ খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হতে পারে, অন্যভাবে এটা সম্ভব নয়।

'ফোকাসিং দি স্ক্রীন', 'দি সিক্সটি ডিগ্রি ক্রসলাইন সেকসান', ইত্যাদি প্রবন্ধে এইভাবে উপেন্দ্রকিশোর সমস্যাগুলিকে যেভাবে নিজে দেখেছেন, তার আলোচনা করেছেন।

"১৯০০ সালের প্রসেস্ ইয়ারবুক-এ 'মোর এক্সপেরিমেন্টস্ উইথ স্টপস' নামে একটি পাতা আছে, সেখানে তুলনামূলকভাবে মোটা পর্দায় দ্বিগুণ ভালো পর্দার মতো ছবি আনার যে পদ্ধতি আমি নিয়েছি তার উল্লেখ আছে ... দি উইচ্ অফ ঘুম-এর ব্লক তৈরি

হয়েছিল ১১০ লাইন স্ক্রীনে, কিন্তু দেখতে মনেহয় যেন ২২০ লাইন স্ক্রীনের মধ্যে তৈরি ..."

'মোর এ্যাবাউট দি হাফ-টোন থিয়োরি'... "আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে হাফ-টোন তত্ত্ব কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। ক্রসলাইন ও অন্যান্য জ্যামিতিগত স্ক্রীনের ক্ষেত্রে এটা জ্যামিতিক অভিক্ষেপন রীতি প্রয়োগের ফল। এটাকে ঠিকভাবে করতে গেলে যে ফলাফল আগে পাওয়া গেছে, তাকে অবহেলা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলি কারও অনুমতি নিয়ে ঘটেনা, এগুলিকে বাদ দিয়েও চলা যাবে না। আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভালো পথ হলো এই ব্যাপারগুলিকে ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করা এবং এইভাবে যে শিক্ষালাভ করবো তাকে ঠিকভাবে অনুসরণ করা।"

'দি থিয়োরি অফ দি হাফ-টোন ডট'... "ফটোগ্রফির ছবির প্রত্যেকটি বিন্দুই হলো মূলের কিছু বিন্দুর ছবি এবং ফটোগ্রাফিতে যেটুকু আলো দেখা যায় তা মূল জায়গা থেকেই পাওয়া।

ছবির কোন জায়গার উজ্জ্বলতা নির্ভর করে মূল জিনিশটির একই জায়গার উজ্জ্বলতার ওপর। মূলের কাছ থেকেই ফটোগ্রাফির লেন্সে ওই আলো গ্রহণ করা হয় এবং ফটোর ছবিতে ওই আলো চলে আসে।

একটা পর্দা যখন মাঝখানে রাখা হচ্ছে, তখন পর্দার বাঁকা অংশগুলিতে এই আলোর অনেকখানি বাদ পড়ে যাচ্ছে। ক খ যদি লেন্সের ছিদ্র হয়, চ ছ পর্দার দাগ; প হলো সুগ্রাহী একটা প্লেটের বিন্দু, তাহলে প যে আলো পাচ্ছে তা আসছে ক গ অংশ থেকে; খ গ এখানে আলো পাঠাতে পারছে না। প-এর উজ্জ্বলতা তাহলে ক গ অনুযায়ী বাড়ছে কমছে ..."

# শতকের সমাপ্তি

১৯০০ সাল নাগাদ উপেন্দ্রকিশোর তাঁর মুদ্রণ ও ফটো এনগ্রেভিং-এর কাজের জন্য ইংল্যান্ডের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। এ বিষয়ে ছবির নকল, নকশাসহযোগে তাঁর অসাধারণ প্রবন্ধগুলি পড়ে সংশ্লিষ্ট ইংরাজ মহলে সবাই এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে এ বিষয়ে আগ্রহী কেউ কেউ বিদেশ থেকে কলকাতায় এসে তাঁর কাজের সঙ্গে যুক্ত হবার ইচ্ছে প্রকাশ করতেন। উপেন্দ্রকিশোর এ সম্পর্কে মাঝে মাঝে মন্তব্য করে বলতেন যে বিদেশে ওঁদের ধারণাই ছিল না যে ভাড়াবাড়ির কয়েকটা ঘর ও বারান্দায় সামান্য উপকরণ দিয়ে কেউ এককভাবে এমন কাজ করতে পারেন।

এ দেশেও তাঁর নাম সুন্দর ছাপার কাজের সমর্থক হয়ে উঠেছিল। সেসময়ে কলকাতা যেকোন উন্নত কাজকর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল, আর উপেন্দ্রকিশোরের কাজ ছিল সবচেয়ে পরিপাটি। অবাক হবার মতো কথা যে একজন ব্যক্তি কী করে শুধু পরিশ্রম ও নিজের প্রচন্ড প্রতিভাবলে একা এই উন্নতমানে পৌছতে পেরেছিলেন, কেননা তিনি কোনদিন কোন বিশেষজ্ঞের কাছে কাজ করে শিক্ষা নেননি, কিংবা কোন কারিগরী স্কুলেও ভর্তি হননি। এ শিল্প ছিল তাঁর সহজাত, জন্মসূত্রে পাওয়া। স্কুলের দিনগুলিতে স্কুলের পাঠ্যবই ও খাতায় ফাঁকা জায়গাগুলি অলঙ্করণে ভরিয়ে তোলার জন্য তাঁকে শিক্ষকদের বিরাগভাজন হতে হতো। পরবর্তী কালে, কলকাতায় তিনি আর্ট শিক্ষকের কাছে জল তেল রঙের কাজ শিখেছিলেন। কিন্তু সেসময় এমন কোন দক্ষ মুদ্রক ছিলেন না যিনি তাঁকে মুদ্রণের কাজ বুঝিয়ে দিতে পারতেন।

গগণেন্দ্রনাথ ও অবণীন্দ্রনাথ ঠাকুর হাভেলের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ভারতীয় শিল্পকলার জন্যে তাঁদের সমস্ত প্রতিভা নিয়োজিত করার বেশ কিছু বছর আগের কথা এসব। বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জমান দেশের ঐতিহ্যগুলিকে শিল্পকলার মাধ্যমে ধরে রাখার জন্য এঁদের প্রচেষ্টা ছিল। ঐতিহ্যের প্রচীন সুরে তাঁরা নিজস্ব অবদানও রাখতে পেরেছিলেন।

উপেন্দ্রকিশোরের কথা বলতে গেলে, কন্‌স্টাব্‌ল, টার্নার ও অন্যান্য শিল্পীরা ছিলেন দৃশ্য-চিত্র অঙ্কণে তাঁর আদর্শ। এঁদের মতো উপেন্দ্রকিশোরও বাস্তব জীবনের ছবি আঁকতেন। তাঁর উগ্রী নদী, পুরীর সমুদ্রতীর বা দার্জিলিংয়ের কাছে তুষারঘেরা পর্বতমালা ইত্যাদি তেলরঙের ছবি বেশ মৌলিক এবং ভালো শিল্পকর্মের নমুনা। ছোটদের গল্পের বইয়ের জন্য আঁকা তাঁর প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণের কাজ আজ পর্যন্ত অতুলনীয় হয়ে আছে। নিজস্ব এক বাস্তব রীতি তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি।

২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের বসার ঘরের দেয়াল ও সিঁড়িতে উপেন্দ্রকিশোর চমৎকার কিছু মিউরাল পেন্টিংয়ের কাজও করেছিলেন। সে সময়ে শিল্পের কাজযুক্ত বাড়ির মূল্য ছিল, তাই বাড়ির মালিক তারপর ভাড়াও বাড়াতে পেরেছিলেন।

ইতিমধ্যে ছয় ছেলেমেয়ে ও অন্যান্যদের নিয়ে এক বিরাট পরিবার তাঁর দায়িত্বে। তাঁর সব ছেলেমেয়েদের মধ্যেই অসাধারণ কিছু গুণাবলী দেখা গেছিল। জ্যেষ্ঠকন্যা সুখলতা, ১৮৮৬ সালে জন্ম, চমৎকার ছবি আঁকতেন। অনেক ইংরাজী রূপকথার অসাধারণ বাংলা রূপান্তর করেছিলেন, সুন্দর পদ্যও লিখতেন তিনি। বেশ লম্বা ও মর্যাদাপূর্ণ চেহারা ছিল। বেথুন কলেজ থেকে প্রথমদিকে যাঁরা গ্র্যাজুয়েট হন, তিনি তাঁদের একজন। ডাক্তার জয়ন্ত রাওয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল এবং বেঁচে ছিলেন আশির ঘরের বয়স পর্যন্ত। তাঁর কয়েকখণ্ড রূপকথার গল্প, দুটো ছড়ার বই, কবিতা ও গান এখনও তরুণ পাঠকদের কাছে মূল্যবান সাহিত্যসামগ্রী হয়ে আছে।

ছেলেদের মধ্যে বড়ো হলেন সুকুমার, সুখলতার দু' বছরের ছোট। ভারতের অন্যতম মেধাবী পুরুষ তিনি - প্রবন্ধকার, কবি, শিল্পী এবং সর্বোপরি ছোটদের জন্য প্রতিভাবান লেখক। মাত্র ছত্রিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে যে অপূর্ব রসের সৃষ্টি তিনি করে গেছেন, সারা ভারতে তার তুলনা নেই। তাঁর একমাত্র সন্তান খ্যাতিমান চলচ্চিত্রনির্মাতা ও শিশুসাহিত্যিক সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রতিভাশক্তির কোন কোন দিক বহন করেছেন। 'আবোল তাবোল', 'খাই খাই' ইত্যাদি গ্রন্থে তিনি নতুন একটা রসের জগতের দ্বার খুলে দিয়েছেন। অননুকরণীয় ঢঙে লেখা তাঁর 'হ-য-ব-র-ল', 'পাগলাদাশু' ইত্যাদির জুড়ি নেই।

এরপর পুণ্যলতা চক্রবর্তী। তাঁর 'ছেলেবেলার দিনগুলি' নামের স্মৃতিকথা শুধু ঐতিহাসিক মূল্য নয়, সাহিত্যের দিক থেকেও উপভোগ্য রচনা। তাঁর 'ছোটদের ছোট গল্প' খুব ছোটদের জন্য গল্পের বই হিসেবে অসাধারণ।

পরবর্তী সন্তান সুবিনয় কম গুণী ছিলেন না - গান গাইতেন, ছোটদের জন্য সুন্দর সুন্দর গল্প লিখেছেন এবং সময়কালে প্রমাণিত হয়েছে যে ছোটদের কাগজের সম্পাদনার কাজেও তাঁর কৃতিত্ব ছিল। ছোটমেয়ে শান্তিলতা দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন, তবে তিনি বেশিদিন বাঁচেননি। তিনিও মজার মজার হাসির কবিতা লিখেছিলেন। সবচেয়ে ছোট ছিলেন সুবিমল, তিনি ছোটদের কাছে উদ্ভট, অদ্ভুত অথচ অতি মজার এক জগৎ খুলে দিয়েছিলেন। তাঁর

গুরুগম্ভীর আধ্যাত্মিক পড়াশুনার পাশে এ এক মজার বৈপরীত্য। একজন স্কুলশিক্ষক হিসেবে জীবন শেষ করলেও তিনি অন্যান্য স্কুল শিক্ষকদের মতো ছিলেন না।

সবমিলিয়ে এটি একটি আদর্শ পরিবার হিসেবে গড়ে উঠেছিল। সেসময়কার উচ্চমান এখানে রক্ষিত ছিল পরিবারের ভিত্তি হিসেবে। কিন্তু সরসতার অভাব ছিল না পরিবারে। সাধারণত ব্রাহ্মদের নামের সঙ্গে যে নিয়ম কঠোরতা ও অসহিষ্ণুতা জড়িয়ে থাকে, এঁদের তা ছিল না। সেইসঙ্গে, কোনধরণের স্বেচ্ছাচারিতাকেও উৎসাহ দেওয়া হতো না।

সময়ও অনুকূল ছিল। নতুন আধুনিক সমাজ বেড়ে উঠেছে। মেধাবী ও বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা এর নেতৃত্বে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর আটপুত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রেরণাদায়ী উপস্থিতি, উপেন্দ্রকিশোরের পুরনো বন্ধু গগণচন্দ্র হোম, রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর নিজে, তাঁর সাহসী শ্বশুর ও শ্বাশুড়ি, গুরুচরণ মহলানবীশের পুত্ররা - বিখ্যাত লোকেদের অভাব ছিল না।

নতুন যুগ ও সেসময়ের সমাজসংস্কারকে ইংরাজ সরকার সদয় চোখেই দেখেছিলেন, আর স্পষ্ট সামাজিক অনিয়মগুলিকে শক্ত হাতে দমন করতেন। শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবে এমন প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল যে সরকারও তা ভাবতে পারেনি। বাংলার প্রত্যেকে এটাকে ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং নানাভাবে তাঁদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন।

গগণচন্দ্র হোমের কন্যা বীণা বসু তখন চার বছরের মেয়ে। ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের একটা মনোরম সকালের স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি। বাড়ির ছোট মেয়েদের স্নান করিয়ে পরিষ্কার জামাকাপড় পরিয়ে রাস্তার দিকের উপরের বারান্দায় বসানো হয়েছে এবং বারবার নিষেধ করা হয়েছে তাদের কথা না বলতে। নিঃশব্দে তারা বিশেষ কিছু ঘটতে যাচ্ছে বলে অপেক্ষা করছে।

শীঘ্রই বাতাসে গানের সুর ভেসে এলো। তারপর দেখা গেল একদল লোক রাস্তার মাঝখান দিয়ে গান গাইতে গাইতে আসছেন। লম্বা ও সুদর্শন চেহারার এক ব্যক্তি, মাথায় লম্বা চুল, গালে সোনালী দাড়ি, লম্বা সাদা ঝোলানো পোশাক পরা, গায়কদলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন; তাঁর সুন্দর কন্ঠস্বর সবার কন্ঠস্বরকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। তাঁর পরেই ছিলেন এক মোটাসোটা ব্যক্তি - গলা থেকে তাঁর একটা হারমোনিয়াম ঝুলছিল, তার গলার স্বরও উচ্চ।

মেয়েটি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিল ওঁদের, সেসময় উপেন্দ্রকিশোর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন, তাঁর হাতে বেহালা। তিনি ওই লম্বা সুন্দর চেহারার মানুষটির পাশে গেলেন এবং দলটি গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চললো। কিছুক্ষণ ধরে বাতাসে তাঁদের কথা ভেসে বেড়ালো - 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল ...' ইত্যাদি। তারপর যারা বাড়ির বাইরে এসেছিলেন, তারাও ফিরে গেছেন নিজের ঘরে।

ছোট্ট মেয়েটির মনে হয়েছিল সাদা পোশাকের ওই মানুষটি নিশ্চয় দেবতা হবেন। দেবতা ছাড়া অন্যদের অমন দেখায় না। অনেক বছর পরে তাকে কেউ জানিয়েছিল, ওই মানুষটি

ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এবং মোটাসোটা বালকটির নাম দীনেন্দ্রনাথ - রবীন্দ্রনাথের বড়ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথের নাতি। ওঁরা সবাই ওদিন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বেরিয়েছিলেন। ওইভাবেই তখন সবকিছু ঘটতো, যার ফলে লোকেরাও অনেকদিন পর্যন্ত তা মনে রাখতো।

# ছোটদের বই

যদিও অন্য প্রসঙ্গে, সমরসেট ম'ম একবার লিখেছিলেন যে গদ্যের জীবন চল্লিশ বছরের, তারপর তা সেকেলে হয়ে যায়, কিন্তু কবিতা চিরকাল বেঁচে থাকে, কেননা তার কারবার চিরন্তন ব্যাপারকে নিয়ে। একই কথা শিশুসাহিত্যের জন্যেও বলা যায়। কবিতার সঙ্গে শিশুসাহিত্যও অমরত্বের স্বাদ ভাগ করে নেয়। একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার যে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য ও উৎকৃষ্ট শিশুসাহিত্যের প্রসঙ্গেই একথা বলছি। প্রখ্যাত লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র এই ধারণার সঙ্গে আর একটা মাত্রা যোগ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সবচেয়ে ভালো শিশুসাহিত্য এমন হবে যা পড়ে সংবেদনশীল বয়স্ক পাঠকও আনন্দ পাবে। শিশুসাহিত্য কোন আলাদা শ্রেণী নয়, শিশুসাহিত্য তাই যা শিশুরা পড়ে বুঝতে পারে ও আনন্দ পায়। ছোটদের বই যে কোন দেশের সাহিত্য সামগ্রীর মূল্যবান অংশ। সবাই জানেন যে ছোটদের জন্যে লেখা অনেক বইকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

এই সমস্ত বিষয় পরবর্তী সময়ের লেখকেরা সুন্দরভাবে বললেও এগুলি উপেন্দ্রকিশোরের ছোটদের জন্য রচনার ভিত্তি তৈরি করেছিল। তাঁর বৈজ্ঞানিক নিবন্ধগুলি ছাড়াও তাঁর সাহিত্য প্রচেষ্টা ছোটদের জন্য প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক ও গল্পের ক্ষেত্রে প্রসারিত ছিল। তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে ছোটদের বই হবে সবচেয়ে ভালো বিষয়ে লেখা, সবচেয়ে ভালো কাগজে ছাপা, সবচেয়ে সুন্দর ছবি ও অলঙ্করণ দিয়ে সাজানো এবং সবচেয়ে ভালো লেখা দিয়ে পুষ্ট। ছোটদের বইকে তিনি দেশের সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করতেন। বড়রা সাধারণত বিনোদনের জন্য বই পড়ে কিংবা কোন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। আর ছোটরা যে বই পড়ে তা দিয়ে তাদের পুরো চিন্তাপ্রবাহ তৈরি হয়ে যায়, তাদের রুচিবোধ তৈরি হয় এবং এই বই থেকে তারা ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান খোঁজে। সবচেয়ে ভালো জিনিশ যা একটা বই ছোটদের জন্য করতে পারে তা হলো, তাদের জীবনকে আনন্দে ভরিয়ে দিতে পারে, কী করে প্রকৃতির জগৎ ও দৈনন্দিন সাধারণ জিনিশগুলি থেকে আনন্দ খুঁজে নিতে হয় তা দেখিয়ে দিতে পারে। এই ছাড়া ছোটদের আর কোন ভালো উপহার হতে

পারে না - একটা বই কয়েক প্রজন্মের ছোটরা পড়ে আনন্দ পেতে পারে, বইয়ের আকর্ষণ এতটুকুও কমেনা।

নিজের কথা বলার জন্য উপেন্দ্রকিশোর তাঁর বড় বড় প্রবন্ধগুলি লেখেননি। নানা বিষয়কে তিনি সহজ করে বলতে চাইতেন। ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন। ছোটদের এই পত্রিকা যে মান তৈরি করেছিল তা আজও অতিক্রম করা যায়নি।

এই পত্রিকা ঘিরে লেখকও পাঠকদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। সে সময়, অন্তত এই ক্ষেত্রে, কোন ঈর্ষা বা দলাদলি ছিল না। লেখকরা কল্পনা করেননি যে ছোটদের জন্য লেখার এই সুযোগ তাদের কাছে এমনভাবে আসবে। তখন লাভালাভের কথা কেউ ভাবতেন না। তখনকার দিনে ছোটদের বই থেকে টাকা রোজগারের কথা কেউ ভাবতে পারতেন না। মাসের শেষে সম্পাদক-প্রকাশককে নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে কাগজের ঘাটতি পূরণ করতে হতো। কাগজটির দাম ছিল কয়েক আনা মাত্র। ভালো ভালো লেখক ও শিল্পীরা 'সন্দেশ'-এ লেখার সুযোগ পেলে গৌরববোধ করতেন। সব চাইতে ভালো লেখাটিই সন্দেশে প্রকাশিত হতো। পুরনো সন্দেশের কোন সংখ্যা যে কোন জায়গার শ্রেষ্ঠ ছোটদের কাগজের সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। সুন্দর কাগজে ছাপা হতো সন্দেশ - অপূর্ব সব জলরঙের ছবি, হাফ-টোন ব্লকে ছাপা, মজার মজার কালি দিয়ে আঁকা ছবি থাকতো। বেশির ভাগ ছবিই সম্পাদকের নিজের আঁকা। এধরণের একটা পত্রিকা এখন প্রকাশ করা খুবই অসম্ভব ব্যাপার, কেননা এর খরচ এখন আকাশ-ছোঁয়া হবে, এবং প্রকাশনা যতো ভালোই হোক, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাগালের বাইরে থেকে যাবে। অথচ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই মূলত সাহিত্যের পাঠক।

পত্রিকার পাঠ্যবিষয় রচনাশৈলী, পরিবেশনা ও বিষয়ের দিক থেকে একটা আদর্শ তৈরি করেছিল, যা এখনকার ছোটদের বইয়ের ক্ষেত্রেও অনুসরণ করা যায়। অবশ্য অজান্তেই ভালো বাংলা ছোটদের বইগুলি উপেন্দ্রকিশোরের পথ অনুসরণ করেছে, এমনিভাবে উপেন্দ্রকিশোরও একদা বিদেশের ছোটদের বই থেকে শিক্ষা নিয়েছিলেন। এটা সম্পূর্ণভাবে সত্যি যে সারা পৃথিবী জুড়ে শিশুসাহিত্যের একটা দুর্মর ও সর্বজনীন ভিত্তি তৈরি হয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে পুরনো রূপকথা, উপকথা, লোককথা, যা নানা দেশজুড়ে ছড়িয়ে আছে, সবার মধ্যে একটা সাদৃশ্য রয়েছে। নাবিক, ব্যবসায়ী, তীর্থযাত্রীরা এইসব কাহিনী এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিয়ে গেছেন বলে এটাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এভাবে কিছু কাহিনী এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রচলিত হয়ে থাকবে হয়তো এবং মূল কাহিনীটিকে নানাসময়ে সে দেশের উপযোগী করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাহিনীর কাঠামোটিই সব নয়। জীবনের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি হলো প্রয়োজনীয় জিনিশ ও গভীরের ব্যাপার। সমস্ত ছোটদের গল্পেরই অন্তর্নিহিত একটা মূল জীবনদর্শন আছে। এই জীবনদর্শন খুব সহজ ও প্রায়ই উদার। জীবন সম্পর্কে

একটা মর্যাদাবোধ এগুলিতে পাওয়া যায়, জীবনের অসুখকর দিকগুলিকেও সহানুভূতির সঙ্গে দেখা হয়েছে। এগুলিতে ভালো লোকেরা সবসময়ই পুরস্কার পায় আর মন্দ লোকেরা সাজা পায়, তবে মন্দ লোকেরা অনুতপ্ত হলে তাদের ক্ষমাও করা হয়। ছেলেমেয়েরা এর চেয়ে আর কী বেশি চাইবে! এগুলি হলো কিছু মৌলিক সত্য, এগুলি উপেন্দ্রকিশোরও তাঁর লেখক ও পাঠকদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন।

আমার আন্তরিক বিশ্বাস যে মুদ্রণ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উপেন্দ্রকিশোরের প্রচেষ্টা মুদ্রণের উন্নতিতে একটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেললেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হলো দেশের সত্যিকার শিশুসাহিত্য বলতে কী বোঝায় তা দেখিয়ে দেওয়া। তুলনামূলকভাবে তাঁর স্বল্পজীবনের দৈর্ঘ্যে তিনি প্রায় অসাধ্য সাধনের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন - শুধু কথায় নয়, তাঁর কাজের মধ্যে দিয়ে।

তিনি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন যে শুধু লেখক নয়, ভালো বই বেছে নেওয়ার জন্যে পাঠকেরও শিক্ষার দরকার আছে। তিনি দেখিয়েছেন যে হাস্যরসেরও একটা স্বাভাবিক ও মার্জিত দিক আছে, রুক্ষ দিকগুলি অবশ্যই পরিহার করা উচিত; এবং নিষ্ঠুরতা ও বীভৎসা ছোটদের উপযোগী বিষয় নয়, কেননা, এর ফলে চিন্তার সূক্ষ্মতা লোপ পায়। এসমস্ত শিক্ষাই তাঁর পরবর্তী প্রতিভাশালী লেখকেরা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু 'সন্দেশ' প্রকাশের ফলে তাঁরা টিকে থাকার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন।

# শিল্পী ও কবি

একজন লেখক ও একজন শিল্পীর কর্মক্ষেত্র যতই আলাদা হোক না কেন, ছোটদের বই প্রকাশনার ব্যাপারে দুজনকেই একজায়গায় আসতে হয়। এটা বলার দরকার হবে না যে উনিশ শতকের শেষ বছরগুলিতে যখন সারা বিশ্ব আগ্রহের সঙ্গে আধুনিক যুগকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত, তখনও কিন্তু গ্রন্থ-অলঙ্করণের কাজের ক্ষেত্রে শৈশবদশা কাটেনি। রুক্ষ চেহারার বাঁধাধরা কিছু ছবি কাঠের ব্লক দিয়ে ছাপা হতো - তা দিয়েই ছোটদের বই ও পত্রপত্রিকা অলঙ্কৃত হতো।

পশ্চিমের দেশগুলিতে অবশ্য এটা অনেক আগেই অনুভব করা হয়েছিল যে ভালো ছবি ও অলঙ্করণে সজ্জিত হলে বইয়ের মূল্য বেশ বেড়ে যায়। বাইবেল ও সেন্টদের জীবন, প্রার্থনা ও স্তবগীতির বইয়ের অলঙ্করণের কাজে মঠের সন্ন্যাসীরা অনেকে সারাজীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন। ধর্ম সংগীত, দেয়াললিপি ও অঙ্কণ ইত্যাদি যে ধর্মীয় আবেগে করা হতো, একই ধর্মীয় ভাবাবেগ থেকেই এসবও করা হতো। এইসব সজ্জার কাজ হাতেই করা হতো, এবং সেসবের যাকিছু দৃষ্টান্ত এখনও রয়েছে সেগুলির মূল্য সংখ্যা ও অর্থের দিক থেকে অপরিসীম।

সাধারণভাবে অবশ্য মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের পরেই সাধারণ ছোটদের বইয়ে ছবি ছাপা হতে শুরু করে। আমাদের দেশেও কিছু ধনী ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির সংগ্রহে হাতে অলঙ্করণ করা বেশ কিছু ধর্মীয় পাণ্ডুলিপি ছিল, কিন্তু কেউ জানতে পারেনি যে ছবির প্রচলনের পর সেগুলির মূল্য বেড়ে যেতে পারে। আগেই বলেছি, প্রাচীন ভারতে ছোটদের জন্য কোন আলাদা বই ছিল না, কিন্তু তাদের উপযোগী সুন্দর সুন্দর উপকথা ও লোককথা লোকের মুখে মুখে ফিরতো এবং স্বভাবতই নানা সংযোজনের ফলে সমৃদ্ধ হতো। পেশাগতভাবে গল্পবলিয়ে অর্থাৎ কথকরা যেখানেই যেতেন, অভ্যর্থনা পেতেন। কখনো কখনো কোন উৎসাহী লেখক গল্পগুলিকে পাণ্ডুলিপির আকারে লিপিবদ্ধ করতেন এখন তখন থেকে তাকে লেখক বলে গণ্য করা হতো। এটা স্বীকার করতেই হবে এরকম অনেক গল্প ও উপকথা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। উনিশ শতকের শেষদিকে কেবল সত্যিই ভালো বাংলা ছোটদের

বই প্রথম সবাই লক্ষ করলেন। আগেই বলেছি, প্রথম দিকে এগুলি পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণে আত্মপ্রকাশ করতো, কিন্তু ক্রমশ বাংলাভাষায় ছোটদের বই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র নিয়ে প্রকাশিত হতে লাগলো, আর সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের অলঙ্করণও নতুন মর্যাদা পেতে থাকলো।

উপেন্দ্রকিশোর সেই প্রথমদিকের সম্পাদকদের একজন যিনি অনুভব করেছিলেন যে ছোটদের বইয়ের ছবি যত ভালো আঁকা হোক, কোন কাজে আসবে না যদি না সেই ছবি পাঠ্য বিষয়টিকে পরিষ্কারভাবে ও আরো সুন্দর করে বোঝাতে সাহায্য করে। অন্যভাবে বলতে গেলে, ভালো শিল্পী হওয়া ছাড়াও একজন আলঙ্কারিককে বইয়ের বিষয়ের গভীরে যেতে হবে এবং লেখকের সূক্ষ্ম বক্রোক্তিগুলিকেও অনুধাবন করতে হবে। ছেলেদের জন্যে রচিত প্রায় বেশিরভাগ গল্প ও প্রবন্ধের একটা ছবির দিক থাকে, যা থেকে একজন শিল্পী কাজ করার সুযোগ পান। বিষয়ের প্রতি মমত্বের এই বাড়তি গুণের জন্যই একজন শিল্পী ভালো আলঙ্কারিক হতে পারেন। এও স্পষ্ট হয়েছে সবার কাছে যে এইসব শিক্ষা উপেন্দ্রকিশোর শুধু মুখেই দেননি, তিনি হাতে-কলমে করে দেখিয়েছেন। তাঁর মতো এমন আর কেউ এটা করতে পারেন নি।

ছোটদের বইয়ের অলঙ্করণ কিন্তু খুব সহজ কাজ নয়। যেমন পাঠে, তেমনি অলঙ্করণের খুঁটিনাটি ব্যাপারে কোন ভুল থাকলে চলবে না। আবার অলঙ্করণ পাঠের বিষয় থেকেও দূরে সরে যাবে না, পোশাক আসাক ও পটভূমি অঙ্কনের ক্ষেত্রে কোন কোন ভুল ধারণা তৈরি করবে না। নিঃসন্দেহে এগুলি প্রাথমিক ব্যাপার - আজকের সব ভালো আলঙ্কারিকেরাই মেনে নিয়েছেন। আধুনিক পাঠকও তার পূর্বসূরীদের তুলনায় অনেক বেশি সমালোচনা মুখর।

একজন লেখক বা সৃজনশীল শিল্পীর যে অবদান দেশের কাছে, সেই তুলনায় তাঁর জীবনের বাস্তব ঘটনাগুলির গুরুত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। উপেন্দ্রকিশোরের সুন্দর চেহারা ও ব্যক্তিমাধুর্যের ফলে তাঁর বন্ধুর সংখ্যা বাড়তো এবং পরোক্ষভাবে তা তার কর্মজীবনে কাজেও লেগেছিল হয়তো, কিন্তু এর সঙ্গে তিনি উত্তরাধিকার হিসেবে যা রেখে গেছেন তার কোন সম্পর্ক নেই। বাংলায় ছোটদের বই প্রকাশনার ক্ষেত্রে তিনি যে অন্যতম প্রধান অগ্রদূত এবং ভারতে ছোটদের বই মুদ্রণের ক্ষেত্রে অগ্রণী পুরুষ ছিলেন তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

ছোটদের জন্য তাঁর নিজের কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্পগুলির মূল সুরটাই ছিল আধুনিকতার এবং এগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে শিশুসাহিত্য চিরকালের। বাংলা বই প্রসঙ্গে একটা অসুবিধের কথা এখানে বলা দরকার। সাম্প্রতিক সব ছোটদের বইয়ে কথ্য বাংলা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পুরনো বাংলার সঙ্গে এর পার্থক্য খুব কম, শুধু ক্রিয়াপদের ব্যবহার অন্যরকম। এখনকার ভাষাও সহজ আরো , পুরনো অনেক বাংলা ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সংস্কৃতধর্মী অনমনীয়তা নেই, আর প্রকাশরীতিও অনেকবেশি ব্যক্তিগত। পুরনো ভাষাও পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত হয়, যাতে দু'ধরনের ভাষা ব্যবহারের সঙ্গেই ছোটরা পরিচিত হতে পারে।

উপেন্দ্রকিশোর সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছেন যে ভালো সাহিত্য কথ্য ভাষাতেও রচিত হতে পারে এবং এ ভাষার নিজস্ব মর্যাদা আছে যা পুরনো বইয়ের কেতাবী ভাষার চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। ক্ষুদে পাঠকদের আস্থা অর্জনই একজন লেখকের বড় পুরস্কার। তাদের ভাষার কাছাকাছি শিশুসাহিত্যের ভাষাকে নিয়ে যেতে পারলে সহজেই ক্ষুদে পাঠকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক পাতানো যায়, কেননা এর ফলে তারা অনুভব করতে পারে যে তাদের নিজেদের চিন্তা এখানে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পুরনো বেশিরভাগ ছোটদের বই-ই স্কুল-মাস্টারসুলভ ঢঙে লেখা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ ছোটদের কবিতা ও গল্প তাদের সম্পর্কে খুবই সুন্দর রচনা, কিন্তু প্রতি তিনটি লেখার মধ্যে একটিই শুধু শিশুর অন্তরের কথা হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বাকিগুলি হয় কবির নিজের শৈশবের স্মৃতিচারণা অথবা কল্পনাহীন পিতামাতা ও শিক্ষকদের জন্যে শিক্ষার বিষয়। অবশ্য এগুলির শব্দব্যবহার এত সুন্দর যে সামান্য সাহায্য নিয়েই ছোটরা সেগুলি উপভোগ করতে পারে। আসলে এগুলির মধ্যে দিয়ে কবির নিজের শৈশবই প্রতিফলিত হয়েছে।

উপেন্দ্রকিশোরের নিজের রচনাগুলি ভিন্নজাতীয়। এসবের মধ্যে দিয়ে তিনি বাস্তব পৃথিবীর জন্যে কী করে নিজেদের প্রস্তুত করতে হয় তাই শুধু শেখান নি, কী করে চারপাশের পৃথিবীকে উপভোগ করার মধ্যে দিয়ে বড় হওয়া যায়, তাও দেখিয়েছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিই আজকের সাধারণ ও সর্বগ্রাহ্য রীতি, কিন্তু এর স্থায়ী জনপ্রিয়তার মূলে আছেন উপেন্দ্রকিশোর ও তাঁর বন্ধুরা।

# সাহিত্যকৃতি

দেশের শিল্প-সংস্কৃতিতে উপেন্দ্রকিশোরের সামগ্রিক অবদানের পরিমাপ ও মূল্যায়ন করতে গিয়ে এই পরিচ্ছদে কিছু কথার পুনরুক্তি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তাঁর প্রথম বই ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত ছোটদের রামায়ন প্রকাশের সময় থেকে ৯০ বছরের বেশি সময়ের ব্যবধান এক অর্থে বাধা না হয়ে বরং সাহায্যই করছে। প্রায়শই লেখক বা শিল্পীর ব্যক্তিগত আকর্ষণ, এমনকি তাঁর ধরনধারন এবং বিষয় নির্বাচন সাধারণ মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এখন এইসব ব্যক্তিগত বিষয় মানুষের স্মৃতি থেকে চলে যাওয়ার পরই লেখক বা শিল্পীর সত্যিকার মূল্যায়ন সম্ভব হয়। যদি ইতিমধ্যে তাঁর সাহিত্যকর্মও বিস্মৃতির মধ্যে গিয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে সময়ের বিচারে সেই সাহিত্যকর্ম উৎরোতে পারেনি। খুব কম ক্ষেত্রে অবশ্য এটাও দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করা গেছে যে সাধারণ মানুষের বিচারবুদ্ধি এত অদূরদর্শী যে কোন মূল্যবান সাহিত্যসম্ভারও চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে।

সৌভাগ্যের বিষয় যে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের বেশিরভাগ প্রকাশনা, সংকলন ও তাঁর নিজের রচনাসম্ভার এবং উপেন্দ্রকিশোরের ছোটদের জন্য রচিত কবিতা, নাটক ও গল্পগুলি অসংখ্য সংস্করণের পর এখনও লোকে প'ড়ে আনন্দ পায়। উপেন্দ্রকিশোরের বইয়ের সংখ্যা খুব বেশি নয়, কিন্তু সারবত্তার দিক থেকে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা নিরীক্ষাধর্মী ভিক্টোরীয় যুগ থেকে এগুলি সরাসরি আধুনিক বিশ শতকে পদক্ষেপ ঘটিয়েছে। কোন মধ্যবর্তী পদচারণা দরকার হয়নি, সেসব পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে ঘটেছে, কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর সম্ভবত হান্স ক্রিস্টিয়ান এ্যান্ডারসন ও অন্যান্য প্রতিভাশালী গল্পবলিয়েদের রচনার মধ্যে নিজের আদর্শ খুঁজে পেয়েছিলেন। এই আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভারতের সুন্দর মহাকাব্য, উপকথা ও লোককথার মূল্যে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। এর ফলস্বরূপ নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সবল ও সমৃদ্ধ এক শিশুসাহিত্য আমরা পেয়েছি। পুরনো লেখকরা যেখানে তাঁদের তরুণ পাঠকদের এক নৈতিকতার বয়স্ক জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন, উপেন্দ্রকিশোর সেখানে তাদের নিজস্ব জগতে প্রবেশের পথ খুঁজে পেয়েছেন, যে জগতে যে কোন ভালো প্রচেষ্টাই

পুরস্কৃত হয় এবং মন্দ লোকেরা যথাযথ শাস্তি পায়, আর প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট হতে পারে।

তাঁর নাটিকা ও কবিতাগুলি খুবই প্রাণবন্ত, হাস্যরসযুক্ত, ও মনোরম - এগুলি ভালো শিশুসাহিত্যের প্রয়োজনীয় গুণ। আর এসবের মধ্যে দিয়ে নৈতিক একটা শিক্ষা বেরিয়ে আসে। প্রকৃতি ও মানুষসৃষ্ট যে কোন সুন্দর জিনিশেরই এমন একটা শিক্ষা থাকে।

আগেই বলেছি যে উপেন্দ্রকিশোর খুব বেশি সাহিত্যকর্ম রেখে যেতে পারেননি, যদিও 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত তাঁর রচনাগুলি দিয়ে বেশ কয়েকটি ছোট ও সুন্দর বই হতে পারে। সন্দেশ-এর প্রথম সংখ্যা বেরোনোর দু বছর পরই ৫২ বছর বয়সে তিনি মারা যান, ফলে নিজের সাহিত্যকর্মের কোন মূল্যায়ণ করাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এরপর সন্দেশের ভার পড়লো তার সুযোগ্য পুত্র, অননুকরণীয় সুকুমার রায়ের হাতে। তাঁর মন ছিল অবিরল গাম্ভীর্য, হাস্যরস ও আনন্দের উৎস, কিন্তু আট বছর পর তিনিও মাত্র ৩৬ বছর বয়সে মারা গেলেন। কিন্তু দুজনে মিলে বাংলা শিশুসাহিত্যকে শুধু একটা চরিত্র ও অবয়ব দিয়ে গেলেন তাই নয়, নানাদিকে এর বলিষ্ঠ প্রসারের পথও খুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও এখনো পর্যন্ত তাঁদের সমকক্ষ কেউ হতে পারেনি।

উপেন্দ্রকিশোরের বইগুলির মধ্যে শুধু 'সেকালের কথা' (যেটি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীদের সম্পর্কে) সময়ের দিক থেকে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, কেননা এ সম্পর্কে গত ৯০ বছরে বৈজ্ঞানিক গবেষণা আমাদের জ্ঞানকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। তিনি 'আকাশের কথা' নামে একটা বইয়ের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন, এবং কিছু কিছু পরিচ্ছদ লিখেছিলেন, কিন্তু দূরদর্শিতার কারণে তিনি বইটি আর প্রকাশ করেন নি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বই, গবেষণাধর্মী রচনা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অগ্রগতির কারণে অনাধুনিক হয়ে যেতে পারে, কিন্তু খাঁটি সাহিত্য সর্বকালের। এখানেও ব্যবহৃত ভাষা ও আঙ্গিক কিছুদিনের মধ্যেই সেকেলে হয়ে যায়, কিন্তু প্রকাশিত সত্যগুলি চিরকাল একই থাকে।

তাঁর 'ছেলেদের রামায়নে'র পর বেরিয়েছিল ছোটদের 'মহাভারতের গল্প', উপকথা ও লোককথার অতুলনীয় সংকলন, 'টুনটুনির বই' - যে বইটিকে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের অমূল্য বই 'খুকুমনির ছড়া'র সঙ্গে তুলনা করা যায়। কিন্তু বই দুটির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো এই যে 'টুনটুনির বই'য়ে পুরনো কাহিনীগুলির মধ্যে দিয়ে উপেন্দ্রকিশোরের ব্যক্তিত্বের হাস্যোজ্জ্বল দিকটি ফুটে উঠেছে, আর 'খুকুমনির ছড়া' চমৎকার ছড়ার সংকলন, কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক।

উপেন্দ্রকিশোরের সুন্দর কবিতাগুলি, তাঁর সরস স্মৃতিচারণা ও সম্পাদকীয়গুলি এখনো আলাদা বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়নি।

সৌভাগ্যক্রমে তিনি মহাভারতের কাহিনীগুলি নিয়ে 'মহাভারতের গল্প' প্রকাশ করেছিলেন। এই বইটি পড়ে পাঠকেরা অনুধাবন করেছিলেন যে পান্ডবদের কাহিনী মহাভারতের সামান্য একটা অংশমাত্র। বিভিন্ন পুরাণ থেকে গল্প নিয়ে তাঁর বই 'পুরাণের গল্প'

আরো পরে বেরিয়েছিল। এগুলি থেকে প্রাচীন পুঁথিপত্রের কি প্রচুর পড়াশুনা তাঁর ছিল তা বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, প্রাচীন এই রচনাগুলিই আমাদের সাহিত্যের সবচেয়ে বড় জাতীয় উপকরণ।

বয়স্কদের জন্য উপেন্দ্রকিশোরের রচনাগুলির কথা বলা বোধহয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ বেহালাবাদক এবং কণ্ঠসংগীত শিল্পী। আর তাঁর 'বেহালা শিক্ষা' ও 'সংগীত শিক্ষা' বইদুটি এখনও প্রশংসিত হয়ে থাকে। তাঁর রচিত ভক্তিগীতিগুলি খুবই সুন্দর এবং আজ পর্যন্ত সেগুলি প্রার্থনাসভায় ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়ে থাকে। এগুলির মূল সুরই হলো ঐশ্বরিক শক্তিতে দৃঢ় আস্থা। আর আগেই বলেছি, তাঁর রং তুলি ও স্কেচপেনের কাজগুলি এখনও দেখার মতো, যেকোন আধুনিক আলঙ্কারিকের কাজের সঙ্গে তুলনীয়।

এরকম অনেক কাজ তিনি আমাদের জন্যে রেখে গেছেন, কিন্তু শিশুদের কাছে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হলো এক দৃঢ়, মুক্ত ও আনন্দের মানসিকতা - যা তাঁর পূর্ববর্তী লেখকেরা অবদমন করেছিলেন। অথচ সব সত্যিকার ছোটদের লেখকেরাই এগুলি ধরার চেষ্টা করেন। উপেন্দ্রকিশোরের বন্ধু অনুরাগী ও আত্মীয়-স্বজনদের নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও প্রচেষ্টা ছাড়া এই ঐতিহ্য আজ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারতো না।

# উত্তরাধিকার

বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে উপেন্দ্রকিশোরের কৃতিত্ব কোন নতুন আন্দোলন সূচিত করার জন্য নয়। তিনি শিশুসাহিত্যকে সঠিক পথে দৃঢ়ভাবে পরিচালিত করেছিলেন। সাহিত্য আন্দোলনের একটা সাময়িক দিক থাকে যা প্রয়োজন শেষ হওয়া মাত্র থিতিয়ে যেতে থাকে।

১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে 'সন্দেশ' এর প্রথম প্রকাশ একটা দিকচিহ্নের মতো হয়ে আছে। একটা গোটা প্রজন্মের উৎসাহী লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশকরা শীঘ্রই এগিয়ে এসেছিলেন। শুধু আমাদের মহাকাব্য ও উপকথা নয়, সারা বিশ্বের মহাকাব্য ও উপকথার অনুবাদ নিয়মিত সন্দেশের পাতায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে অতি সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পর্কে আকর্ষণীয় প্রবন্ধ। এছাড়া দেশবিদেশের নানা জায়গায় যাঁরা বেড়িয়েছেন তাঁদের লেখা ভ্রমণকাহিনী ছাপা হয়েছে। পড়ার বিষয়গুলির মধ্যে তথ্যমূলক এইসব রচনাগুলি বেশ মূল্যবান ছিল এবং বাংলা শিশুসাহিত্যে একটা বলিষ্ঠ দিক সূচিত হয়েছিল।

রূপকথা, উপকথা, প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা, নীতিকথাধর্মী গল্প, ইতিহাস ও প্রাকৃতিক ইতিহাসে অভ্যস্ত তরুণ পাঠকেরা আগ্রহের সঙ্গে এই নতুন সাহিত্য উপাদান উপভোগ করেছে। এমনকি কেউ কেউ নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা লেখারও চেষ্টা করেছে। এইভাবে পাঠকের সঙ্গে একটা যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। এটা খুব আস্তে আস্তে হয়েছিল, কেননা প্রথমদিকের সন্দেশ-এর পাতায় ছোটদের লেখা তেমন স্থান পায়নি।

উপেন্দ্রকিশোরের জ্যেষ্ঠপুত্র সুকুমার যে এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তিনি এক অসাধারণ রসবোধ নিয়েই জন্মেছিলেন, যা আজ দুর্লভ। তাঁর হাস্যরস ছিল গাম্ভীর্যেরই অপর পিঠ। দুইয়ে কোন বিরোধ নেই এটা তিনি দেখিয়েছেন - যা তাঁকে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ রসরচনাকার ও আধুনিক যুগের ভাষ্যকার করে তুলেছে।

কৌতুক অভিনেতার মতো ভাঁড়ামি করে হাসাবার চেষ্টা করেননি সুকুমার - হাস্যরসের আসল চরিত্র তাঁর জানা ছিল। তাঁর হাসির কবিতা ও গল্পের মধ্যে থেকে জীবন ও মানুষের

দুর্বলতাগুলির ওপর তির্যক মন্তব্য বেরিয়ে এসেছে। এই মন্তব্যগুলি এত আন্তরিক ও মজার যে প্রত্যেক পাঠক অনুভব করতে পারতেন যে মানুষের দুর্বলতাগুলি সম্পর্কে নির্দয় ব্যঙ্গ করে লেখা পুরনো হাসির কবিতাগুলির চেয়ে সুকুমারের রচনা সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর ব্যঙ্গে নির্দয়তা নেই, সমবেদনা আছে, যা প্রত্যেককে স্পর্শ করে এবং মনে আত্মসমীক্ষার শিখাটিকে উসকে দেয়।

আগেই বলেছি, সুকুমার সবার দৃষ্টি কেড়েছিলেন। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর কোনো ছোটদের কাগজই সন্দেশ-এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি। তারপর থেকে বাংলায় হাস্যরস এক বিশেষ ধারা হয়ে উঠেছে। এখন অবশ্য শস্তা ছবির হাস্যকৌতুক দুর্ভাগ্যক্রমে বাজার জমিয়েছে। এগুলির স্বপক্ষে একটাই যুক্তি আছে, তা হল এই যে নিরক্ষর লোকেরা পর্যন্ত এগুলি উপভোগ করতে পারে। মুস্কিলটা এখানেই। কেননা নিরক্ষরদের অক্ষরজ্ঞান দেওয়ার বদলে শিশুসাহিত্যের মান নামিয়ে আনা হচ্ছে। তবে যাই হোক, উপেন্দ্রকিশোর এসব কিছু দেখে যাননি। দেখে যাননি সুকুমারও। তাঁদের অবদান এখন পর্যন্ত বাংলার সাহিত্যচিন্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে আছে। অপ্রিয় কথাটা তবু থেকেই যায় — যতখানি মনোযোগ দেওয়া দরকার, ছোটদের বইয়ের জন্য এখনও তা দেওয়া হচ্ছে না।

'সন্দেশ' প্রকাশিত হতে শুরু হওয়ার দু'বছর পর, ১৯১৫ সালে উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হয়। স্বাভাবিকভাবেই সম্পাদক হলেন সুকুমার। ইতিমধ্যে তিনি লন্ডনে গিয়ে ফটো ও প্রিন্টিং টেকনোলজিতে পড়াশুনা করে ইংল্যান্ডের রয়াল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটির ডিগ্রী ও ফেলোশিপ নিয়ে ফিরেছেন। তিনি ছিলেন জাতশিল্পী। উপেন্দ্রকিশোরের উত্তরাধিকার তাঁর ওপর শুধু বর্তায়নি, তাকে ফলপ্রসূ করে তোলার দায়িত্বও এলো তাঁর ওপর। তিনি সে দায়িত্ব পালনও করেছিলেন যথাযথভাবে। প্রকাশনার কাজের সবচেয়ে গন্ডগোলে ব্যাপার হলো লে-আউটের কাজ, সুকুমার এই শিল্পে দারুণ দক্ষ ছিলেন। এখানে বলা দরকার যে এই প্রতিভা তিনি পারিবারিকসূত্রেই পেয়েছিলেন এবং সুকুমারের একমাত্র পুত্র, বিখ্যাত সিনেমা নির্মাতা সত্যজিৎ রায় এই শিল্পটিকে আরো উন্নত করেছেন, তাঁর বইয়ের অলঙ্করণ ও লে-আউটের কাজের তুলনা মেলেনা। তিরিশ বছর পর সন্দেশকে তিনি আবার উজ্জীবিত করেছেন তাঁর মায়ের একান্ত আগ্রহে, ১৯৬১ সালে। পুরনোদিনের উচ্চমান ধরে রাখার জন্য তিনি সবরকম চেষ্টা করে গেছেন এবং মান উন্নত করতে সফলও হয়েছেন। তাঁর পিতা ও পিতামহের সময়ের মতো বন্ধু ও আত্মীয়রা তাঁর পাশে ছিলেন। 'সন্দেশ' এখন বাংলার ছোটদের মুখ্য পত্রিকাগুলির মধ্যে একটি। এর কোন বাণিজ্যিক উচ্চাশা নেই। একমাত্র উদ্দেশ্য, সব ভালো শিল্প সাহিত্যেরই যা মূল নীতি, সেই সত্যবাদিতা, জ্ঞান, মহত্ত্ব, সুরুচি, চরিত্র, দৃঢ়তা, ধৈর্য, হাস্যরস ইত্যাদি নানা বিষয়। 'সন্দেশ' উপেন্দ্রকিশোরের জীবন্ত উত্তরাধিকার - তাঁর শৈল্পিক ও বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাগুলির প্রতিমূর্তি। যে কোনো সজীব বিষয়ের মতো সন্দেশ-ও বদলেছে এবং নতুন পথ খোঁজার চেষ্টা করেছে। ইউ রে এ্যান্ড সন্সের কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করার দুর্লভ সৌভাগ্য

যাঁদের হয়েছিল, বিশেষত 'সন্দেশ' প্রকাশিত হওয়ার সময় তাঁদের মুষ্টিমেয় কয়েকজনমাত্র এখন জীবিত , তাঁরা উপেন্দ্রকিশোরের গভীর আত্মোৎসর্গ দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে এখনও স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে সতৃষ্ণভাবে ওইদিনগুলিতে যেন ফিরে যান। আজকের দিনের নৈতিকতাহীন বাণিজ্যের তুলনায় সেইসব দিনের প্রকাশক ও সম্পাদকদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নিঃস্বার্থ।

আগেই বলেছি, উপেন্দ্রকিশোরের একার পক্ষে এতটা সব কাজ করে ওঠা সম্ভব হতো না। বর্তমান গ্রন্থকারসহ বেশ কিছু বয়স্ক নারীপুরুষ সুকিয়াস্ট্রীটে উপেন্দ্রকিশোরের ছোট দোতলা ভাড়াবাড়িটার কথা মনে করতে পারেন। নীচের তলার সামনের দিকে ছাপাখানার বিকট শব্দ আর অন্যত্রও মানুষের গলার শব্দে গমগম করতো। সেখানে ছোট ছেলেমেয়েদের যাওয়া বারণ ছিল। তবে বাতিল ছবির লোভে তারা সেখানে উঁকি মারতো।

উপেন্দ্রকিশোর ও তাঁর ছোটভাই কুলদারঞ্জনকে নীচেরতলার ঘরের কোণে দেখা যেত হাতে কলম ও পাশে কালির দোয়াত নিয়ে বসে মগ্ন হয়ে প্রুফ দেখছেন। তাঁদের কৃতিত্ব ছিল যে ইউ রে এ্যান্ড সন্স প্রকাশিত বইয়ে বানানভুল বা অস্পষ্ট ছাপা প্রায় থাকতোই না।

কেউ একটা পয়সা পেতেন না, কিন্তু লেখক ও আলঙ্কারিকেরা তাদের কাজ মুদ্রিত দেখলে গর্বিত হতেন। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাইয়েরা সম্পর্কে ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের কাকা-শ্বশুর, কিন্তু তাঁরা উপেন্দ্রকিশোরকে দারুণ শ্রদ্ধা করতেন। ছোটভাই লিখতেন মেজদাদা নামে, নানা কীটপতঙ্গ, মাছ, সরীসৃপ প্রাণী, ব্যাঙ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর ছোট লেখাগুলি ছোট্ট পাঠকদের খুবই ভালো লাগতো। আর একজন দারুণ লেখক ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমী জগদানন্দ রায়।

প্রিয়ম্বদা দেবী সুন্দর কবিতা লিখে পাঠাতেন। তিনি অসাধারণ একটা গল্প লিখেছিলেন কাঠের পুতুল পাঁচুলাল নামে, গল্পটি পুরনো ইটালীয় গল্পের অবলম্বনে লেখা হয়েছিল। জগদীশ চন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ, অবণীন্দ্রনাথ, বিজয়রত্ন মজুমদার, এঁরা সবাই লিখতেন।

এইসমস্ত লেখাগুলির বেশিরভাগই উপেন্দ্রকিশোরের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু এগুলিকে তাঁর প্রচেষ্টার ফসল হিসোবে গণ্য করা যায়। তিনি উল্লেখযোগ্য দুটি বছর ধরে 'সন্দেশ' এর সম্পাদনা করেছেন। তারপর আট বছর ধরে সুকুমার কাগজটিকে বিষয়বৈভব ও আয়তনে ব্যাপ্তি দিয়েছেন।

উপেন্দ্রকিশোর ও তাঁর পুত্রেরা সবসময় নতুন প্রতিভার সন্ধানে থাকতেন। কারো সন্ধান পেলে এইসব লেখকদের সহায়তা করতেন। যেমন সুনির্মল বসু, পরে নাম করেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের ভাই কুলদারঞ্জনের অনুবাদকর্মের কথা আমরা আগেই বলেছি, অপর ভাই প্রমদারঞ্জন বার্মা ও সিয়ামের গভীর জঙ্গলে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন। দুই কন্যা, সুখলতা ও পুণ্যলতা দীর্ঘ কর্মজীবন লাভ করেছিলেন এবং শিশুসাহিত্যের উন্নতির জন্য যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

# শেষের কদিন

উপেন্দ্রকিশোরের জীবনের সমাপ্তি শীঘ্রই ঘনিয়ে এসেছিল এবং তা এসেছিল এত করুণভাবে যে কেউ ভাবতেই পারেনি। সুঠামদেহী চার-ভাইদের মতো তাঁর কিন্তু কখনো খেলাধূলা বা শরীরচর্চ্চায় আগ্রহ ছিল না। তাঁর মন ছিল অন্য জায়গায়। সারদারঞ্জনের নাম ভারতীয় ক্রিকেটের সমার্থক ছিল। আর খেলার মাঠে মুক্তিদারঞ্জনের অসাধারণ চেহারা ছিল সবার কাছে অবাক হওয়ার মতো। তাঁর ছোট দু'ভাই যাঁরা মুক্তিদারঞ্জনের আগেই মারা যান, প্রায়ই তাঁরা শরীরচর্চ্চার কথা গল্প করতেন - কেমন করে তিনি ব্যায়ামাগারের ছাদের রিং ধরে ঝুলতেন আর দুভাইকে তাঁর পা ধরে রাখতে বলতেন, এরপর তিনি এই দু'জন সহ নিজেকে হাতের ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে তুলতেন যতক্ষণ না তাঁর মাথা ছাদে ঠেকে যেতো এবং হাত পুরোটা সোজা হতো। আরো অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার হতো, তিনি যখন হাতদুটোকে নীচু করতেন ক্রমশ মাটির দিকে। ব্যাপারটা যে সত্যিই খুব অস্বাভাবিক ছিল, তা শরীরচর্চ্চার সঙ্গে যুক্ত সবাই স্বীকার করতেন।

খেলাধূলাকে মর্যাদার স্থান দিতে উপেন্দ্রকিশোরের ভাইয়েরা ও লেখাপড়ার জগতে তাঁদের পরিপার্শ্বের সবাই যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা সফল হয়েছিল। তখন পর্যন্ত খেলাধূলাকে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সহজতম রাস্তা বলেই মনে করা হতো।

উপেন্দ্রকিশোর অবশ্য তাঁর নিজের ক্ষেত্রেই অক্লান্ত কর্মশক্তি ও সীমাহীন উদ্যোগ দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর কাজের প্রকৃতি এমন ছিল যে তাঁকে সারাদিন বসে থাকতে হতো। ডায়াবেটিস রোগের শিকার হয়েছিলেন তিনি। এ রোগের তখন একটাই ওষুধ ছিল যা দিয়ে আর রোগটি বাড়তে পারতো না। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই ওষধুটি তৈরি হতো জার্মানীতে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় ওষুধ আসা বন্ধ হয়েছিল। ফলে তাঁর রোগের একমাত্র ওষুধটিও তিনি পেলেন না। ১৯১৫ সালের ২০ ডিসেম্বর ৫২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হল।

উপেন্দ্রকিশোর বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি আর বেশিদিন থাকবেন না, তাই খুব সাহসের সঙ্গেই মৃত্যুর জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। বিলেতে প্রিন্টিং টেকনোলজিতে

ট্রেনিং নিয়ে ইতিমধ্যেই সুকুমার ডিগ্রী লাভ করেছেন এবং দেশে ফিরে এসেছেন ১৯১৩ সালে। সুন্দর একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়েও হয়েছে। ১০০ নম্বর গড়পার রোডের বাড়ি তৈরি হয়েছে এবং পরিবারটি সেখানে বাস করছে। সুকুমারের বয়স তখন ২৯ বছর। তিনি ও ছোটভাই সুবিনয় সব কাজের ভার তুলে নিলেন। এঁদের চেয়ে যোগ্যতর আর যে কেউ ছিল না তাতে সন্দেহ নেই।

মৃত্যুর একদিন আগে উপেন্দ্রকিশোরের ঘরের জানলায় একটা পাখি এসে বসলো এবং কিছুক্ষণ শব্দ করে উড়ে গেল। উপেন্দ্রকিশোর হাসিমুখে তাঁর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, "কি বলে গেল শুনেছো ?" ভারাক্রান্ত হৃদয় বিধুমুখীর - তিনি জিগ্যেস করলেন, "কী বলে গেল ?"

"বললো, এই পথে, এই পথে, তারপর উড়ে গেল।" পরদিন মানুষটির জীবনের অবসান হলো। তিনি রেখে গেলেন তাঁর ভগ্ন-হৃদয় মা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন এবং অনেক শোকসন্তপ্ত বন্ধু ও আত্মীয়স্বজনকে। কিন্তু মৃত্যুতেই এইধরণের মানুষদের সবকিছু শেষ হয়ে যায় না। তাঁদের অসমাপ্ত কাজে যাঁরা এগিয়ে আসেন তাদের কাজে ও ভাবনায় তাঁরা চিরকাল বেঁচে থাকেন।

টাকাপয়সা ধনসম্পত্তির মতো প্রতিভা বংশপরম্পরায় হস্তান্তরিত হয় না। কিন্তু প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের গৃহে ও কর্মক্ষেত্রে যে পরিবেশ তৈরি হয়, তাতে অন্যরাও একইপথে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত হয়। রক্তের মধ্যে দিয়ে যে জীন বংশপরম্পরায় বাহিত হয়ে চলে, তা নিয়েও আলোচনা হতে পারে।

কারণ যাই হোক, ময়মনসিংহের মসূয়া গ্রামের রায়পরিবারের ছেলেমেয়েদের সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও কখনো কখনো সংগীতে সৃজনশীল ঝোঁক বরাবরই দেখা গেছে। হয়তো সবাই উপেন্দ্রকিশোরের মর্যাদায় পৌঁছতে পারেন নি, কিন্তু অননুকরণীয় সুকুমার রায় যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা কোন অংশেই কম নয়। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে হাস্যরসের ধারণায় তিনি এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সি ভি রামন, জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে ভারতকে বিশ্বের চোখে যে মর্যাদায় দাঁড় করিয়েছিলেন, সুকুমারের মেধাবী পুত্র, চলচ্চিত্রকার, লেখক, শিল্পী ও সংগীতজ্ঞ সত্যজিৎ তাঁর নিজের ক্ষেত্রে একই সুনাম এনে দিয়েছেন।

এমন কৃতী মানুষের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়, কিন্তু এটা উল্লেখ করার মতো বিষয় যে শিশু সাহিত্যের সেবায় উপেন্দ্রকিশোরের ভাইয়েরা, ছেলেমেয়েরা, অনেক আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুরা নিজেদের জীবনকে নিয়োজিত করেছেন অর্থনৈতিক কোন লাভ ছাড়াই এবং এক উদার সাহিত্য ঐতিহ্য তৈরি করতে তাঁরা সাহায্য করেছেন, যা এখনও সক্রিয়, ফলদায়ী, বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং বিশ্বের সেরা শিশুসাহিত্যের পাশে দাঁড়াবার অধিকারী।

রায় পরিবার এখন বিচ্ছিন্ন। ময়মনসিংহের বাস্তুভূমিও আর নেই। অশান্ত নদনদীসহ যে বিস্তীর্ণ সবুজ গ্রামাঞ্চলে ওইসব মানুষেরা বেড়ে উঠেছিলেন, তা আজ ভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত।

কিন্তু যেখানেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাংলা বই পড়ে সেখানেই উপেন্দ্রকিশোরের স্মৃতি দীর্ঘস্থায়ী হতে থাকে।

সবচেয়ে দুঃখের কথা হলো, উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর আট বছর পর যখন কালাজ্বরে সুকুমারেরও মৃত্যু হলো, তখন তাঁর সাধের ইউ রে এ্যান্ড সন্স উঠে গেল। উঠে যাওয়ার প্রধান কারণটি অবশ্য আরো পরিতাপের। ব্যবসায়িক দিক থেকে তেমন কিছু না হলেও কোম্পানির কিছু দেনা ছিল, এবং পাওনাদারেরা তা শোধ করা নিয়ে পীড়াপীড়ি করতো। বেশ ভালো অংকের চলমান মূলধন ছিল কিন্তু সেসব আদায় করা যায়নি। সমস্ত দায়টাই পড়েছিল তরুণ ও অনভিজ্ঞ সুবিনয়ের ওপর। এর ফল হলো, নতুন বাড়ি, ছাপাখানা ইত্যাদি দু' বছর বয়স্ক সত্যজিতের অংশটুকু বাদে সবটাই নীলামে উঠেছিল। যিনি কিনে নিয়েছিলেন, তিনি বেশিদিন চালাতে পারেননি। 'সন্দেশ' এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেল। পরে নতুন মালিকেরা সুবিনয়ের সম্পাদনায় এটির পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেছিলেন এবং কিছু দারুণ ভালো সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু পুরো ব্যবস্থাটাই ছিল অপ্রতুল, ফলে বছর দুই তিন বাদে প্রকাশনা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৬১ সালে সত্যজিতের যখন ৪৫ বছর বয়স, তখন মার অনুরোধে তিনি নিজের খরচে 'সন্দেশ' প্রকাশ করেন। 'সন্দেশ' এর পুরনো সহযোগী ও বন্ধু যাঁরা তখন জীবিত ছিলেন, সত্যজিতের পাশে এসে দাঁড়ালেন। দু' বছর পরে সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি নামে একটি রেজেস্ট্রিকৃত সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমবায় সমিতিই 'সন্দেশ' এর বর্তমান মালিক। কাগজটিও এখন ত্রিশ বছরের পুরনো - উপেন্দ্রকিশোরের সুন্দর স্মৃতি হয়ে আছে।

□□

printed at Jay Kay Offset Printers, 17 DSIDC, Rohtak Road, New Delhi.